ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৬
এপ্রিল-জুন : ২০১৬

ফিক্‌হী ইখতিলাফ (মতপার্থক্য) : স্বরূপ ও শিষ্টাচার

ড. আহমদ আলী[*]

Juristic Disagreement : Nature & Manners

ABSTRACT

Mujtahid Imāms of different juristic schools of thought differ in many practical affairs of Islam based on evidences from Sharī‘ah It's caused by the differences in viewpoints of Imāms, inexplicitness of evidences from Sharī‘ah and sometimes limitation in their knowledge on evidences. This difference in views is sometimes simply external and of linguistic nature, and often related to the determination of nature of ‘amal (action/work); though sometimes this may be contradictory in nature. Sometimes this difference remains confined within the ‘amal (action) only and doesn't affect rules of Sharia itself. Such disagreement on many affairs due to the difference in viewpoints, understanding as well as knowledge is one of the instances of Allah's skillful creations and it is spontaneous and natural. This type of disagreements is not objectionable if these happen based on authentic evidences of Sharī‘ah and proper reasoning and aren't devoid of etiquette & morality. Sometimes it's beneficial too. The definition of Ikhtilāf (juristic disagreement), rules and classification of juristic disagreement, its nature and manners, its mode in various era and benefits of liberal disagreements of Imāms etc. are gathered in a descriptive and deductive methods in this article.

Keywords: *Ikhtilāf (disagreement); Ijtihād (juristic opinion); Adāb (manners); Rahmat (compassion).*

সারসংক্ষেপ

দীনের ব্যবহারিক অনেক বিষয়ে শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে মুজতাহিদ ইমামগণ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। এর কারণ, কখনো তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য, কখনো

[*] প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

দলীলের দ্ব্যর্থকতা বা প্রচ্ছন্নতা, কখনো তাঁদের দলীল সংক্রান্ত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। উপরন্তু, তাঁদের এ মতভিন্নতা কখনো বাহ্যিক ও শাব্দিক হয়ে থাকে; কখনো তা ‘আমালের স্বরূপ নির্ণয় কেন্দ্রিক হয়ে থাকে, কখনো তা পরস্পর বিরোধীও হয়ে যায়। আবার কখনো এ ভিন্নতা কেবল ‘আমলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে; বিধান পর্যন্ত গড়ায় না। দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ও বুদ্ধি-বিবেকগত তারতম্যের কারণে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে যে মতভিন্নতা দেখা দেয়, তা আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্টি নৈপুণ্যের একটি নিদর্শন এবং স্বাভাবিক নিয়মেই তা তৈরি হয়। এরূপ মতভিন্নতা দূষণীয় নয়, যদি তা বিশুদ্ধ দলীল ও যুক্তিনির্ভর হয় এবং শিষ্টাচার ও নীতিবিবর্জিত না হয়। তদুপরি ক্ষেত্রেবিশেষে তা উপকারীও। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ইখতিলাফের পরিচয়, ফিক্‌হী ইখতিলাফের বিধান ও বিভিন্ন প্রকরণ, বিভিন্ন যুগে ফিক্‌হী ইখতিলাফের ধরন, প্রকৃতি ও আদাব এবং ইমামগণের উদারনৈতিক ইখতিলাফের (মতপার্থক্যের) সুফল প্রভৃতি বিষয় বর্ণনামূলক ও অবরোহ পদ্ধতিতে বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

মূলশব্দ: ইখতিলাফ; ইজতিহাদ; আদাব; রাহমাত।

ইখতিলাফ শব্দের অর্থ ও প্রকারভেদ

‘ইখতিলাফ’ (اختلاف) শব্দটি আরবী। এর প্রকৃত অর্থ ভিন্নতা, পার্থক্য, অসঙ্গতি বৈপরীত্য প্রভৃতি। শব্দটি সাধারণত ভাষা, বর্ণ, অবস্থা, আকৃতি, মত ও পথ তথা যে কোনো ধরনের পার্থক্য, অসঙ্গতি ও ভিন্নতা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হলেও মত ও চিন্তা-দর্শনের ক্ষেত্রে পরস্পর ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করার অর্থে বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, ‘ইখতিলাফ’ (اختلاف) শব্দটি সর্বার্থে আরবী ضدّ (বিপরীত) শব্দের সমার্থক নয়। কেননা, পরস্পর বিপরীত প্রত্যেক বিষয়ই ভিন্ন হয়ে থাকে; কিন্তু প্রত্যেক ভিন্ন বিষয় পরস্পর বিপরীত নাও হতে পারে। তাছাড়া ‘ইখতিলাফ’ (পরস্পর মতভিন্নতা) যেহেতু অনেক সময় বাদানুবাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাই শব্দটি রূপকার্থে তর্কবিবাদ (التَّنَازُع) অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ অর্থে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ “আর এভাবে তারা হামেশাই নিজেদের মধ্যে তর্কবিবাদ করতে থাকবে।”[১]

ফিকহ শাস্ত্রে ‘ইখতিলাফ’ বলতে দীনের যে কোনো ব্যবহারিক বিষয়ে শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে মুজতাহিদ ইমামগণের পরস্পর ভিন্ন মত পোষণ করাকে বোঝানো হয়। সেই ভিন্নমত তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণে হতে পারে, কিংবা দলীলের দ্ব্যর্থকতা বা প্রচ্ছন্নতার কারণে হতে পারে অথবা দলীল সংক্রান্ত তাঁদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে হতে পারে।

১. আল-কুরআন, ১১ : ১১৮

উল্লেখ্য যে, ইমামগণের এ মতভিন্নতা কখনো বাহ্যিক (صوري) ও শাব্দিক (لفظي/ تعبيري)[২] হয়ে থাকে। কখনো তা ‘আমালের স্বরূপ নির্ণয়গত (اختلاف التنوع)[৩] হয়ে থাকে, কখনো তা পরস্পর বিরোধী (اختلاف التضاد)ও[৪] হয়ে থাকে। আবার কখনো এ ভিন্নতা কেবল ‘আমালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে; হুক্‌ম সাব্যস্ত করে না।[৫]

উল্লেখ্য যে, আরবীতে خلَاف (খিলাফ) শব্দটিসাধারণত ‘ইখতিলাফ’ শব্দের সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে কেউ কেউ এ দুটি শব্দের ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্যও

---

২. যেমন ‘আমাল ঈমানের অংশ কী না? এতদসংক্রান্ত ইমামগণের মধ্যে যে মতভেদ রয়েছে তা নিছক শাব্দিক ও অভিব্যক্তিগত। (‘আইনী, *উমদাতুল কারী,* খ. ১, পৃ. ২৭৬) এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা রাহ.-এর মত হলো, ‘আমাল ঈমানের অংশ নয়। তিনি তাঁর এ মত সত্ত্বেও কখনোই ঈমানের জন্য ‘আমালের গুরুত্বকে ছোট করে দেখেননি। কাজেই জানা যায় যে, তাঁর কথার আসল উদ্দেশ্য হলো, ‘আমাল ঈমানের মৌলিক অংশ নয়; বরং পরিপূরক শর্ত। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামের মতে, ‘আমালও ঈমানের একটি অংশ। তবে তাঁদের কেউ এরূপ কথা বলেননি যে, কেউ যদি ‘আমালের ক্ষেত্রে কোনো ক্রটি করে, তা হলে সে বে-ঈমান হয়ে যাবে। এ থেকে বুঝা গেল, তাঁদের কথার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, ‘আমাল ঈমানের মৌলিক অংশ। বরং তাঁদের কথার উদ্দেশ্য হলো- ‘আমাল ঈমানের একটি পরিপূরক অংশ। অতএব, এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে যে মতপার্থক্য রয়েছে তা নিছক শাব্দিক ও অভিব্যক্তিগত পার্থক্য; পরস্পর বিরোধী মত নয়।

৩. যেমন কোনো ইমাম কোনো একটা ‘আমালকে ওয়াজিব বলেছেন, আবার অন্য ইমাম একই ‘আমালকে ফরয বলেছেন। অনুরূপভাবে কোনো ইমাম কোনো একটা ‘আমালকে সুন্নাত বলেছেন, অপর কোনো ইমাম একই ‘আমালকে মুস্তাহাব্ব বলেছেন। বস্তুত প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এ মতপার্থক্যের বিশেষ কোনো প্রভাব নেই।
আবার এমনও অনেক ‘আমাল রয়েছে, যা মৌলিকত্বের বিচারে সর্বসম্মতভাবে প্রমাণসিদ্ধ; তবে এ ‘আমালসমূহ আদায়ের বিভিন্ন পদ্ধতিও সমাজে প্রচলিত রয়েছে এবং এ সব পদ্ধতি সকলের মতে মেনে চলাও জায়িয। (যেমন- দু‘আ কুনূত রুকু‘র আগে বা পরে পড়া) তবে এ ‘আমালসমূহের প্রচলিত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে কোন্ পদ্ধতিটি অধিকতর বিশুদ্ধ ও উত্তম? তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ফিকহশাস্ত্রে এরূপ মতপার্থক্যের সংখ্যাই বেশি। উল্লেখ্য যে, ইমামগণের মধ্যে এ জাতীয় যে মতপার্থক্য দেখা যায়, তা প্রকৃত অর্থে পরস্পর বিরোধী মত নয়। অর্থাৎ এমন নয় যে, এক ইমামের দৃষ্টিতে যেটা সাহীহ, অপর ইমামের দৃষ্টিতে সেটা বাতিল।

৪. যেমন- নাক থেকে রক্তক্ষরণ হলে অযু নষ্ট হবে কি-না? কারো মতে, এরূপ অবস্থায় অযু ভঙ্গ হবে, অপর কারো মতে, অযু ভঙ্গ হবে না। এ জাতীয় মতপার্থক্য খুব অল্প সংখ্যক মাস’আলার ক্ষেত্রে দেখা যায়।

৫. যেমন- যেসব ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ‘আমাল করার অবকাশ রয়েছে। যথা- কুরআনের বিভিন্ন বিধিবদ্ধ কিরা’আত। হয়তো কোনো কারী কুরআনের এক ধরনের কিরা’আত অনুসরণ করেন; কিন্তু অন্য কিরা’আতগুলোকে অস্বীকার করেন না। এটা প্রকৃতপক্ষে কোনো ইখতিলাফ নয়। কেননা এ কিরা’আতগুলোর প্রত্যেকটি বিশুদ্ধ হবার ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য নেই। এর প্রত্যেকটিই মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত।

করেছেন। যেমন- ‘ইখতিলাফ’ শব্দটি বিশুদ্ধ দলীলনির্ভর মতানৈক্যের ক্ষেত্রে এবং ‘খিলাফ’ শব্দটি দলীলবিহীন কিংবা দুর্বল দলীলনির্ভর মতানৈক্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। মুহাম্মাদ ইবনু ‘আলী থানবী রহ. বলেন, অগ্রগণ্য (الرَّاجح) মতের বিপরীতে দুর্বল অভিমত (الْمَرْجُوح)কে ‘খিলাফ’ বলা হয়; ‘ইখতিলাফ’ বলা হয় না। মোটকথা, ‘খিলাফ’-এর ক্ষেত্রে মতভেদকারীর কথা দুর্বল হয়ে থাকে। যেমন- বলা হয় যে, সে ইজমা‘র খিলাফ করেছে। পক্ষান্তরে ‘ইখতিলাফ’-এর ক্ষেত্রে মতভেদকারীর কথা দুর্বল হয় না।

আবার কারো কারো মতে, ‘খিলাফ’ শব্দটি ‘ইখতিলাফ’-এর চেয়ে ব্যাপকতাজ্ঞাপক। এটি ইজমা‘র বিরোধিতার ক্ষেত্রে যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি ব্যক্তিবিশেষের মতের বিরোধিতার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।[৬]

ইসলামে ইখতিলাফের বিধান

আল-কুরআনের বহু আয়াত ও বিভিন্ন হাদীসে সকল মু’মিনকে একত্রিত থাকতে এবং পরস্পর মতপার্থক্য না করতে দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো আয়াত ও হাদীসে মতপার্থক্যে লিপ্ত হবার কঠিন পরিণতি সম্পর্কেও লোকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿... وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ - مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾

“... এবং কখনোই মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ো না, (তাদের মধ্যে এমনও আছে যে,) যারা তাদের দীনকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে এবং তারা নানা ফেরকায় পরিণত হয়ে গেছে। প্রত্যেক দলই নিজেদের কাছে যা কিছু রয়েছে, তা নিয়ে উৎফুল্ল।”[৭]

অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

﴿ وَلَاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

“আর তোমরা তাদের মতো হয়ে যেয়ো না, যাদের কাছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং (নিজেদের মধ্যে) নানা ধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে। এরাই হচ্ছে সে সব লোক, যাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে।”[৮]

---

৬. *আল-মাওসূ‘আতুল ফিকহিয়্যাহ* (কুয়েত: ওয়াযারাতুল আওকাফ..., ১৪০৪ হি.), খ. ২, পৃ. ২৯১-২

৭. আল-কুরআন, ৩০ : ৩১-৩২

৮. আল-কুরআন, ৩ : ১০৫

তিনি আরো বলেন, ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ “যারা এ কিতাব নিয়ে মতানৈক্যে লিপ্ত হয়েছে, তারা সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।”[৯] রাসূলুল্লাহ স. বলেন, وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ - “ তোমরা মতবিরোধ করো না। কেননা এতে তোমাদের অন্তরগুলোর মধ্যেও দূরত্ব তৈরি হবে।”[১০] অন্য একটি হাদীসে তিনি বলেন, إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلاَفِهِمْ فِى الْكِتَابِ.- “তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো কেবল এ জন্যই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তারা (আল্লাহর) কিতাব নিয়ে মতবিরোধ করতো।”[১১]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, ইসলামে যে কোনো বিষয়ে- চাই তা ‘আকীদা সংক্রান্ত ব্যাপার হোক কিংবা ‘আমাল সংক্রান্ত হোক- মতবিরোধ করার কোনো নীতিগত ভিত্তি নেই। বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা এবং স্বার্থপ্রণোদিত কিংবা প্রবৃত্তিতাড়িত যে কোনো বিরোধিতা ইসলামের দৃষ্টিতে চরম নিন্দনীয়।

তবে এ কথাও অনস্বীকার্য যে, মানুষে মানুষে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষণ, বিচার বিশ্লেষণ একেক জনের একেক রকম। ক্ষেত্রবিশেষে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিতেই পারে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ﴾

> “আর তোমার রাব্ব চাইলে দুনিয়ার সব মানুষকে একই উম্মাত বানিয়ে দিতে পারতেন। (কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা কারো ওপর তাঁর ইচ্ছা চাপিয়ে দেন না।) আর এভাবে তারা সর্বদাই নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করতে থাকবে। তবে তোমার রাব্ব যার প্রতি দয়া করেন তার কথা আলাদা।”[১২]

উক্ত আয়াত থেকে জানা যায় যে, দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ও বুদ্ধি-বিবেকগত তারতম্যের কারণে বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে যে মতভিন্নতা দেখা দেয়, তা আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্টি নৈপুণ্যের একটি নিদর্শন এবং স্বাভাবিক নিয়মেই তা ঘটে থাকে। এরূপ মতভিন্নতা দূষণীয় নয়, যদি তা বিশুদ্ধ দলীল ও যুক্তিনির্ভর হয় এবং শিষ্টাচার ও নীতিবিবর্জিত না হয়। ক্ষেত্র বিশেষে তা উপকারীও বটে। আমাদের সালাফে সালিহীন (পূর্বসূরী) দীনের ইজতিহাদী বিষয়ে মতপার্থক্য করেছেন। তবে তাঁদের সে মতপার্থক্যে কোনো প্রকারের জিদ্, হঠকারিতা ও গোঁড়ামির স্থান ছিল না। তাঁরা

৯. আল-কুরআন, ২ : ১৭৬
১০. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, অধ্যায়: সালাত, পরিচ্ছেদ: তাসবিয়াতুস সুফূফ, হা. নং: ১০০০
১১. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, অধ্যায়: ‘ইলম, পরিচ্ছেদ: আন-নাহয়ু ‘আন মুতাশাবিহিল কুরআন, তাসবিয়াতুস সুফূফ, হা. নং: ৬৯৪৭
১২. আল-কুরআন, ১১ : ১১৮-৯

মতবিরোধ করেছেন তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনার স্বাভাবিক পার্থক্যের কারণে এবং তা ছিল অতি ক্ষণস্থায়ী। ইচ্ছাকৃত কিংবা জিদের বশবর্তী হয়ে তাঁরা কখনো মতবিরোধ করেননি। যতটুকু করেছেন তা প্রয়োজনের তাগিদে একান্ত বাধ্য হয়ে। তাঁরা যথাসাধ্য মতবিরোধ থেকে বাঁচার চেষ্টা করতেন এবং যখনই তাঁরা কোনো সঠিক দলীল পেতেন, সাথে সাথে তাঁরা সকলেই প্রসন্নচিত্তে তা গ্রহণ করে নিতেন। তাঁদের মতবিরোধের পেছনে একান্ত উদ্দেশ্য ছিল, নিজ নিজ ইজতিহাদের মাধ্যমে কুর’আন ও হাদীসের ওপর নিজেদের ও উম্মাতের ‘আমাল প্রতিষ্ঠা করা এবং এভাবে আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। তাঁদের মতবিরোধ তাঁদের মধ্যে অন্তরের সামান্যতম দূরত্বও তৈরি করেনি, তাঁদেরকে নানা দলে-উপদলে বিভক্তও করেনি। বরং এ মতপার্থক্য সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে নজীরবিহীন। পরমত সহিষ্ণুতা ছিল তাঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁদের এরূপ ইজতিহাদভিত্তিক উদারনৈতিক মতপার্থক্য বহু ক্ষেত্রে উম্মাতকে প্রশস্ততাও দান করেছে। এ কারণে অনেকেই তাঁদের এ মতপার্থক্যকে উম্মাতের জন্য রাহমাতরূপেও বিবেচনা করেছেন।[১৩] ইসলামের পঞ্চম খলীফা সাইয়্যিদুনা ‘উমার ইবনু ‘আবদিল ‘আযীয রা. সাহাবা কিরাম রা.-এর মতবিরোধ সম্পর্কে বলেন:

ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا ، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة

> “রাসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবীগণের মধ্যে মতভিন্নতা না থাকাটা আমার কাছে আনন্দের বিষয় নয়। কেননা, যদি তাঁরা কোনো বিষয়ে মতানৈক্য না করতেন, তা হলে (পরবর্তীদের জন্য) কোনো ছাড়ই থাকতো না।”[১৪]

অর্থাৎ এরূপ অবস্থায় উত্তরসূরীরা অনেক ক্ষেত্রে সংকীর্ণ অবস্থায় পড়ে যেতো। কেননা, যদি তাঁরা সব বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করতেন, তা হলে যে কেউ কোনো বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করলে সে পথভ্রষ্টরূপে পরিগণিত হতো। এখন যেসব বিষয়ে তাঁরা মতানৈক্য করেছেন, সেসব ক্ষেত্রে- যেহেতু তাঁরা প্রত্যেকেই অনুসরণীয় ইমাম, তাই- প্রত্যেকের জন্য এ অবকাশ রয়েছে যে, তিনি যে কারো অনুসরণ করতে পারেন। এ জন্য অন্ততপক্ষে কাউকে পথভ্রষ্ট বলা যাবে না। বিশিষ্ট ফাকীহ তাবি‘ঈ আল-কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ [৩৭-১০৭ হি.] রহ. বলেন:

كان اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نفع الله به، فما عملت منه من
عمل لم يدخل نفسك منه شيء .

১৩. ইব্রাহীম শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত* (দারু ইবনি ‘আফফান, ১৯৯৭ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৭৫
১৪. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, *আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, (http://www.alsunnah.com), খ. ১, পৃ. ৪০৪; ইবনু তাইমিয়্যাহ, *মাজমূ‘উল ফাতাওয়া* (দারুল ওয়াফা, ২০০৫ খ্রি.), খ. ৩০, পৃ. ৮০

"রাসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবীগণের মতপার্থক্য আল্লাহ তা'আলার কল্যাণকর বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম। তুমি (তাঁদের মধ্যে) যাঁর মতানুযায়ী যে 'আমালই করো না কেন, এতে তোমার মনের মধ্যে কোনো অপ্রসন্ন ভাবসঞ্চার হবে না।"[১৫]

উল্লেখ্য যে, সাহাবা কিরামের ইজতিহাদভিত্তিক মতপার্থক্যের মধ্যে উম্মাতের জন্য প্রশস্ততা রয়েছে এবং তা উম্মাতের জন্য রাহমাতস্বরূপ, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে কথাটি সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়; কিন্তু এরূপ সাধারণ সমীকরণ সকলেই মেনে নিতে চান না। যেমন- ইমাম মালিক [৯৩-১৭৯ হি.] রহ. বলেন:

لَيْسَ فِي اخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعَةٌ، وَإِنَّمَا الْحَقُّ فِي وَاحِدٍ ... لا يكون قولان مختلفان صوابين.

"রাসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবীগণের মতভিন্নতার মধ্যে কোনোরূপ প্রশস্ততা নেই। হক কেবল যে কোনো একজনের পক্ষেই থাকবে। ...পরস্পর ভিন্ন দুটি মত সঠিক হতে পারে না।"[১৬]

ইমাম লাইছ ইবনু সা'দ [৯৪-১৭৫ হি.] রহ. এর ও অনুরূপ বক্তব্য রয়েছে।[১৭] কাযী ইসমা'ঈল [২০০-২৮২ হি.] রহ. বলেন:

إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي، فأما أن يكون توسعة لأن يقول الناس بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا.

"রাসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবীগণের মতভিন্নতার মধ্যে প্রশস্ততা রয়েছে- এ কথার একান্ত তাৎপর্য হলো, চিন্তা-গবেষণা করে রায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রশস্ততা। প্রশস্ততার অর্থ এ নয় যে, লোকেরা তাঁদের যে কারো মত গ্রহণ করবেন, যদিও তাঁর কথায় হক নিহিত না থাকে।"[১৮]

ইবনু 'আবদিল বার্‌র [৩৬৮-৪৬৩ হি.] রহ. বলেন, كلام إسماعيل هذا حسن جدا.- "ইসমা'ঈলের এ কথা অত্যন্ত চমৎকার।"[১৯] একবার আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস

১৫. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, *আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ,* খ. ১, পৃ. ৪০৪
১৬. শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত,* খ. ৫, পৃ. ৭৫
১৭. ইবনু হাযম, *আল-ইহকামু ফী উসূলিল আহকাম* (কায়রো: দারুল হাদীস, ১৪০৪ হি.), খ. ৬, পৃ. ৩১৭; ইবনু 'আবদিল বার্‌র, *জামি'উ বায়ানিল 'ইলম ও ফাদলিহি* (দারু ইবনি হায্‌ম, ২০০৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৬৪
قال ابن القاسم سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس كما قال ناس فيه توسعة ليس كذلك إنما هو خطأ وصواب
১৮. ইবনু 'আবদিল বার্‌র, *জামি'উ বায়ান,* খ. ২, পৃ. ১৬৪; শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত,* খ. ৫, পৃ. ৭৫
১৯. ইবনু 'আবদিল বার্‌র, *জামি'উ বায়ান, খ. ২, পৃ.* ১৬৪

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক [১১৮-১৮১ হি.] রহ. কে সাহাবীগণের ইখতিলাফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তাঁদের প্রত্যেকের কথাই কী সঠিক? তখন তিনি জবাব দেন, الصواب واحد، والخطأ موضوع عن القوم، أرجو "সঠিক মত একটিই। তবে আমি আশা করি যে, ভুল মতটি তাঁদের নিকট বিবেচ্য হয়নি।"[২০]

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ [৬৬১-৭২৮ হি.] রহ. এ দু ধরনের বক্তব্যের মধ্যে সুন্দর সমন্বয় করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, মতানৈক্য যেমন কখনো রাহমাতের উপলক্ষ হতে পারে, তেমনি কখনো তা 'আযাবেরও উপলক্ষ হতে পারে। তিনি বলেন:

النِّزَاعُ فِي الأَحْكَامِ قَدْ يَكُونُ رَحْمَةً إِذَا لَمْ يُفْضِ إِلَى شَرٍّ عَظِيمٍ مِنْ خَفَاءِ الْحُكْمِ. وَالْحَقُّ فِي نَفْسِ الأَمْرِ وَاحِدٌ، وَقَدْ يَكُونُ خَفَاؤُهُ عَلَى الْمُكَلَّفِ - لِمَا فِي ظُهُورِهِ مِنَ الشِّدَّةِ عَلَيْهِ - مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بِهِ، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ. وَهَكَذَا مَا يُوجَدُ فِي الأَسْوَاقِ مِنَ الطَّعَامِ وَالثِّيَابِ قَدْ يَكُونُ فِي نَفْسِ الأَمْرِ مَغْصُوبًا، فَإِذَا لَمْ يَعْلَمِ الإِنْسَانُ بِذَلِكَ كَانَ كُلُّهُ حَلاَلاً لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ بِحَالٍ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا عَلِمَ. فَخَفَاءُ الْعِلْمِ بِمَا يُوجِبُ الشِّدَّةَ قَدْ يَكُونُ رَحْمَةً، كَمَا أَنَّ خَفَاءَ الْعِلْمِ بِمَا يُوجِبُ الرُّخْصَةَ قَدْ يَكُونُ عُقُوبَةً، كَمَا أَنَّ رَفْعَ الشَّكِّ قَدْ يَكُونُ رَحْمَةً وَقَدْ يَكُونُ عُقُوبَةً.

"বিধি-বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে পরস্পর মতানৈক্য কখনো রাহমাত হতে পারে, যদি সঠিক হুকমটি প্রচ্ছন্ন থাকার কারণে তা বড় ধরনের কোনো অনিষ্টের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। বস্তুতপক্ষে হক একটিই। কখনো এ হক প্রচ্ছন্ন থাকার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি রাহমাত হয়ে থাকে। কেননা এ হক সুস্পষ্ট হলে কখনো তাদের কষ্টে নিপতিত হতে হতো। এটা আল্লাহ তা'আলার বাণী "তোমরা এমন সব বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না, যদি তা তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হয়, তা হলে তোমাদের খারাপ লাগবে।"-এর পর্যায়ভুক্ত। যেমন- বাজারে অনেক খাদ্য ও পোশাক পাওয়া যায়। এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এগুলো বাজারে কারো থেকে অপহরণ করে নিয়ে আসা হয়েছে। যারা এ ব্যাপারে অজ্ঞাত তাদের জন্য এগুলো হালাল। কিন্তু যারা এ ব্যাপারে অবগত যে, এগুলো অপহৃত সম্পদ, তাদের জন্য এগুলো ক্রয় করা জায়িয হবে না। কাজেই যে জ্ঞান জটিলতা তৈরি করে, তা জানা না থাকলে কখনো রাহমাত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে যে জ্ঞান সহজ অবস্থা তৈরি করে, তা জানা না থাকলে কখনো শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে সন্দেহ দূরীকরণও কখনো রাহমাতের উপলক্ষ হয়, আবার কখনো শাস্তির উপলক্ষ হয়।"[২১]

আমরা নিম্নে ইসলামে ফিকহী মতপার্থক্যের উৎপত্তি এবং এর স্বরূপ ও শিষ্টাচার সম্পর্কে আলোচনা করবো।

২০. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, *আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ,* খ. ১, পৃ. ৪০৩
২১. ইবনু তাইমিয়্যাহ, *মাজমু'উল ফাতাওয়া* (দারুল ওয়াফা, ২০০৫ খ্রি.), খ. ১৪, পৃ. ১৫৯

রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে মতপার্থক্য

রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে তাঁর অনুসারীগণের মধ্যে কোনোরূপ মতপার্থক্য দানা বাঁধতে পারেনি। এ সময় যদিও ক্ষেত্রবিশেষে সাহাবা কিরাম রহ.-এর মধ্যেও কিছুটা মতপার্থক্য তৈরি হতো; তবে তাঁর উপস্থিতির সুবাদে এ মতপার্থক্য সহজেই নিরসন হয়ে যেতো। তাঁরা যখনই কোনো সমস্যা বা মতপার্থক্যের সম্মুখীন হতেন, তখন রাসূলুল্লাহ স.-এর শরণাপন্ন হতেন। তিনি তাঁদেরকে সঠিক ফায়সালাটি জানিয়ে দিতেন। তবে তখনকার এরূপ কিছু ঘটনার কথাও জানা যায় যে, সাহাবা কিরাম রা. কোনো অভিযানে মাদীনা থেকে বেশ দূরে অবস্থা করছিলেন এবং এমন সময় তাঁরা এরূপ কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হন যে, যা নিয়ে তাঁদের মধ্যে রীতিমত মতপার্থক্য তৈরি হয় এবং তখন এ মতপার্থক্য নিরসনের জন্য তাঁদের পক্ষে মাদীনায় রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট আসাও সম্ভব হতো না। ফলে তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের মতো ইজতিহাদ করে 'আমাল করতেন। পরে যখন তাঁরা মাদীনায় ফিরে আসতেন, তখন তাঁরা সকলেই রাসূলুল্লাহ স.কে ঘটনাটি জানাতেন এবং সে সাথে তাঁদের নিজেদের ইজতিহাদগুলোও পেশ করতেন। রাসূলুল্লাহ স. ঘটনাটির পুরো বৃত্তান্ত শুনে হয়তো তাঁদের ইজতিহাদগুলো বহাল রাখতেন অথবা সঠিক ফায়সালাটি জানিয়ে দিতেন। সাহাবা কিরাম রা. সঠিক ফায়সালাটি জেনে খুশি হতেন এবং এভাবে তাঁদের মধ্যকার মতপার্থক্যও নিরসন হয়ে যেতো। নিম্নে এরূপ কয়েকটি ঘটনার কথা আলোচনা করা হলো:

ক. সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ স. সাহাবীদের বললেন, لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ "তোমাদের কেউ যেন বানূ কুরাইযা পৌঁছার পূর্বে সালাত আদায় না করে।" পথে সালাতুল 'আসরের সময় শেষ হওয়ার উপক্রম হলে একদল সাহাবী বললেন, এমনকি সময় পার হয়ে গেলেও বানূ কুরাইযায় পৌঁছার পূর্বে আমরা সালাত আদায় করবো না। অপর একদল সাহাবী বললেন, আমরা পথিমধ্যেই সময়মতো সালাত আদায় করবো। কেননা সালাত কাযা করানো রাসূলুল্লাহ স.-এর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং আমাদের গতি দ্রুত করাই ছিল তাঁর একান্ত উদ্দেশ্য, যাতে সালাতুল আসরের পূর্বে সেখানে পৌঁছা যায়। ঘটনা শুনে রাসূলুল্লাহ কোনো দলকেই তিরস্কার করেননি।[২২]

---

২২. ইমাম বুখারী, *আস-সাহীহ*, অধ্যায়: আল-মাগাযী, পরিচ্ছেদ: মারজি'উন্নাবী সা. মিনাল আহযাব হা. নং: ৩৮৯৩
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنْ الْأَحْزَابِ: " لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمْ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ.

হাফিয 'আবদুর রাহমান আস-সুহাইলী [৫০৮-৫৮১ হি.] রহ. ও অন্যান্য বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণ বলেন, এ হাদীস থেকে দুটি বিষয় বোঝা যায়,

এক. আয়াত বা হাদীসের বাহ্যিক অর্থের ওপর আমল করা যেমন দূষণীয় নয়, তেমনি ইজতিহাদের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিশেষ অর্থ গ্রহণ করাও নিন্দনীয় নয়।

দুই. শারীআহের অপ্রধান বিষয়সমূহে মুজতাহিদগণের সকলেই সঠিক। তাঁদের কাউকেই ভ্রান্ত বলা যাবে না।[২৩] কাজেই মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে পরস্পরের বিভাজনকে রাসূলুল্লাহ স. ভালো চোখে দেখেননি। তিনি এরূপ আচরণের নিন্দা করেছেন।

খ. সাইয়িদুনা 'আমর ইবনুল 'আস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাতুল সালাসিল যুদ্ধের সময় এক প্রচণ্ড ঠাণ্ডা রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়েছিল। এ সময় আমার আশঙ্কা হয়েছিল যে, যদি আমি গোসল করি তাহলে আমি মরে যাবো। ফলে আমি তায়াম্মুম করে সাথীদের নিয়ে ফাজরের নামায আদায় করি। অভিযান থেকে ফিরে এসে তাঁরা ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ স. কে অবহিত করেন। তিনি এটা শোনে বললেন, "হে 'আম্র! তুমি অপবিত্র অবস্থায় সাথীদের নিয়ে নামায পড়লে?!" তখন আমি তাঁকে গোসল না করার কারণ জানালাম এবং বললাম যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا "তোমাদের নিজেদের মেরে ফেলো না। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।" এ কথা শোনে রাসূলুল্লাহ স. হাসলেন; কিছু বললেন না।[২৪]

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, যদিও 'আমর ইবনুল 'আস রা.-এর উক্ত ইজতিহাদ সাহাবীগণের নিকট পছন্দনীয় হয়নি এবং এ কারণে তাঁরা মাদীনায় ফিরে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ স.কে অবহিত করেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ স. 'আমর ইবনুল 'আস রা.-এর বক্তব্য শোনে তাঁর ইজতিহাদ অনুমোদন করলেন। এ থেকে অনেক উসুলবিদই মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে তাঁর অনুপস্থিতিতে সাহাবীগণের ইজতিহাদ করে আমাল করা জায়িয ছিল।[২৫]

---

২৩. ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী* (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হি.), খ. ৭, পৃ. ৪০৯

২৪. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায়: তাহারাত, পরিচ্ছেদ: ইযা খাফাল জুনুবু আল্‌বারদা.., হা. নং: ৩৩৪
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ احْتَلَمْتُ فِى لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِى غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِى الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ ». فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِى مَنَعَنِى مِنَ الاِغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّى سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ (وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.

২৫. ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী* (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হি.), খ. ১, পৃ. ৪৫৪; বাদরুদ্দীন আল-'আইনী, *শারহু সুনানি আবী দাউদ* (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ১৯৯৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৫০

গ. সাইয়িদুনা আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার দুজন ব্যক্তি সফরে বের হন। পথিমধ্যে তাঁদের নামাযের সময় হয়। কিন্তু তাঁদের সাথে অযু করার মতো কোনো পানি ছিল না। ফলে তাঁরা দুজনেই পবিত্র মাটিতে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে নেন। এরপর নামাযের সময়ের মধ্যে তাঁরা দুজনেই পানি পেলেন। ফলে তাঁদের একজন অযু করে পুনরায় নামায আদায় করলেন; কিন্তু অপর ব্যক্তি পুনরায় নামায পড়লেন না। পরবর্তীতে তাঁরা দুজনেই রাসূলুল্লাহ স.-এর খিদমাতে এসে তাঁকে তাঁদের উক্ত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ স. যিনি পুনরায় নামায পড়ে দেননি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ. "তুমি সঠিক নিয়মই পালন করেছো। তোমার ঐ নামাযই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।" আর যিনি অযু করে পুনরায় নামায পড়ে দেন রাসূলুল্লাহ স. তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ. "তোমার জন্য দুবারই পুরস্কার রয়েছে।"[২৬]

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, তাঁরা দুজনেই নিজে নিজে ইজতিহাদ করে 'আমাল করেন এবং তা নিয়ে তাঁদের দুজনের মধ্যে মতভিন্নতাও দেখা দেয়। কিন্তু পরে রাসূলুল্লাহ স. তাঁদের মতপার্থক্যের কথা জানতে পেরে তাঁদের কাউকে তিরস্কার তো করলেনই না; বরং তাঁদের প্রত্যেকের 'আমাল অনুমোদন করলেন। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে তাঁর অনুপস্থিতিতে সাহাবীগণ ক্ষেত্রবিশেষে ইজতিহাদ করে আমাল করতেন এবং তা নিয়ে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে মতপার্থক্যও দেখা দিতো। পরে রাসূলুল্লাহ স. তাঁদের মতপার্থক্যের কথা জানতে পেরে তাঁদের প্রত্যেকের 'আমাল অনুমোদনও করতেন।

ঘ. সাইয়িদুনা জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমাদের জনৈক সাথীর মাথা ফেটে যায়। পরবর্তীতে তার গোসল ফারয হলে তিনি এ অবস্থায় তায়াম্মুম করার কোনো সুযোগ আছে কি-না জানতে চাইলেন। সাথীরা বললো, যেহেতু তুমি পানি ব্যবহার করতে পারছো, তাই তোমার তায়াম্মুম করার কোনো সুযোগ নেই। তখন তিনি বাধ্য হয়ে গোসল করলেন। এতে তাঁর মৃত্যু হলো। আমরা মাদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ স.কে ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি তাঁর সাথীদেরকে কঠোরভাবে তিরস্কার করে বললেন, قتلوه قتلهم الله الا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السوال "তারা তাকে খুন

২৬. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায়: তাহারাত, পরিচ্ছেদ: আল-মুতাইয়াম্মিম ইয়াজিদুল মা'আ.., হা. নং: ৩৩৮
عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلاَنِ فِى سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِى الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاَةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِى لَمْ يُعِدْ « أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ ». وَقَالَ لِلَّذِى تَوَضَّأَ وَأَعَادَ « لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ ».

করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংস করুন! জানা না থাকলে তারা জিজ্ঞাসা করে নিলো না কেন? জিজ্ঞাসাই তো হলো অজ্ঞতার নিরাময়। তার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল যে, সে তায়াম্মুম করবে অথবা ক্ষতস্থানে পট্টি বাঁধবে এবং তার ওপর মাসহ করবে আর শরীরের অন্যান্য অংশ ধুয়ে ফেলবে।"[২৭]

এ হাদীস থেকেও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে তাঁর অনুপস্থিতিতে সাহাবীগণ ক্ষেত্রবিশেষে ইজতিহাদ করে আমাল করতেন। তবে তিনি এরূপ কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের ইজতিহাদকে অনুমোদন দেননি। বিশেষ করে যাঁদের ইজতিহাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নেই, তাঁরা নিজেরা ইজতিহাদ করে সিদ্ধান্ত দেবেন- এটা তিনি মোটের ওপর পছন্দ করতেন না। বরং তাঁদের একান্ত কর্তব্য হলো, বিজ্ঞ 'আলিমের শরণাপন্ন হওয়া এবং তাঁদের কথা মেনে চলা।[২৮]

রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে মতপার্থক্যের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

ইতঃপূর্বে রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে মতপার্থক্যের যে অবস্থা আলোচনা করা হলো, তার আলোকে আমরা তাঁর সময়কার মতপার্থক্যের কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে তুলে ধরতে পারি।

ক. সাহাবা কিরাম রা. যথাসাধ্য মতবিরোধ থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করতেন। এ কারণে তাঁরা ভবিষ্যতে সংঘটিত হতে পারে- এমন সব বিষয় ও খুঁটিনাটি ব্যাপার এড়িয়ে যেতেন। তাঁরা কেবল বাধ্য হয়েই সময়ে সময়ে আপতিত বিভিন্ন পরিস্থিতি ও ঘটনাতে নিজেদের করণীয় জানতে চেষ্টা করতেন। এর ফলে আপতিত ঘটনার তাৎক্ষণিক সমাধান বের করার প্রয়োজনে দ্বন্দ্ব-সংঘাত তো দূরের কথা, পরস্পর মতবিরোধে জড়িয়ে পড়ার সুযোগও তাঁদের বেশি ছিল না।

খ. মতবিরোধ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি তাঁদের মধ্যে ঘটনাক্রমে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিতো, তখন তাঁরা দেরি না করে দ্রুত আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ স.-এর শরণাপন্ন হতেন। এভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁদের মতবিরোধ নিরসন হয়ে যেতো।

২৭. দারাকুতনী, *আস-সুনান*, অধ্যায়: তাহারাত, পরিচ্ছেদ: জাওয়াযুত তায়াম্মুম লি-সাহিবিল জিরাহ..., খ. ১, পৃ. ১৮৯, হা. নং: ৬৪/৩; বাইহাকী, আস-সুনানুস সুগরা, অধ্যায়: তাহারাত, পরিচ্ছেদ: আত-তায়াম্মুম, হা. নং: ১৮১
عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون في رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله الا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السوال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده.

২৮. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, *আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, খ. ২, পৃ. ৩৫৩

গ. যে কোনো বিরোধের সময় তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতেন এবং পরিপূর্ণরূপে তা মেনে চলতেন।

ঘ. অনেক ব্যাখ্যানির্ভর বিষয়ে রাসূলুল্লাহ স. মতবিরোধকারীদের পরস্পর ভিন্ন সব মতকেই সঠিক বলে অনুমোদন দেন। এতে প্রত্যেকেরই এ ধারণা লাভ হতো যে, তিনি যে মত পোষণ করেছেন তা যেমন সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, তেমনি তাঁর অপর ভাইয়ের মতও সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। বস্তুতপক্ষে এ ধারণা মতবিরোধকারীদের প্রত্যেককে একে অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শিক্ষা দেয় এবং নিজের মতের প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক ভূমিকা গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে।

ঙ. সাহাবীগণের মতবিরোধের পেছনে সকলের একান্ত উদ্দেশ্য ছিল, নিজ নিজ ইজতিহাদের মাধ্যমে সত্য বের করা ও তার ওপর 'আমাল করা। তাঁদের সে মতবিরোধে কোনো প্রকারের স্বার্থপরতা, আত্মপ্রীতি, হঠকারিতা ও গোঁড়ামির স্থান ছিল না।

চ. সাহাবীগণ মতবিরোধের ক্ষেত্রে কখনো ইসলামের সাধারণ শিষ্টাচার-রীতি লঙ্ঘন করতেন না। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের অভিমত যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করতেন, একে অপরের মত গভীর মনোযোগ সহকারে শোনতেন, সুন্দর ও মার্জিত ভাষা ব্যবহার করতেন এবং যে কোনোভাবে কটাক্ষ করা থেকে বিরত থাকতেন।

সাহাবা কিরাম ও মুজতাহিদ ইমামগণের যুগে মতপার্থক্য

রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে যেমন ফিকহী বিষয়ে ক্ষেত্রবিশেষে ইজতিহাদী মতপার্থক্য দেখা গিয়েছিল, তেমনি তাঁর ইন্তিকালের পর সাহাবা কিরামের আমলেও এরূপ মতপার্থক্য দেখা গিয়েছিল। তদুপরি এসময়কার অনেক বিষয়ের মতপার্থক্য অমীমাংসিতও থেকে যায়। যেমন- সালাত আদায় তরককারীর কাফির হওয়া বা না-হওয়া, গোসলে মহিলাদের মাথার খোপা খোলা বা না-খোলা, গর্ভবতী নারী বিধবা হলে 'ইদ্দাতের সময়কাল কতটুকু হবে প্রভৃতি বিষয়গুলো সাহাবা কিরামের আমলেও অমীমাংসিত ছিল। সাহাবা কিরাম রা.-এর পর মুজতাহিদ ইমামগণও কুর'আন ও হাদীস এবং নিজস্ব কতিপয় মূলনীতি অনুসরণ করে নানা বিষয়ে ইজতিহাদ করেছেন এবং তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে বেশ মতপার্থক্যও দেখা দেয়। কিন্তু সাহাবা কিরাম রা. ও মুজতাহিদ ইমামগণের এ মতপার্থক্যের মধ্যে আমরা কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও শিষ্টাচার দেখতে পাই। যেমন-

ক. নিজের মতকে একমাত্র সঠিক মনে না করা

মুজতাহিদ ইমামগণ যদিও শারী'আতের অপ্রধান বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য করেছেন; কিন্তু তাঁদের কেউ নিজের মতকে একমাত্র সঠিক মত এবং অন্যান্যের মতকে ভ্রান্ত

মনে করতেন না। বরং তাঁদের প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি হতো এই যে, তাঁর মতটি তাঁর গবেষণা ও চিন্তা অনুযায়ী সঠিক; কিন্তু প্রকৃত বিচারে তা ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে। অপরদিকে অন্যের মতটি তাঁর গবেষণা ও চিন্তা অনুযায়ী ভুল; কিন্তু প্রকৃত বিচারে তা সঠিক হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে। এ কারণে মুজতাহিদ ইমামগণ তাঁদের মতামত খুব কমই দৃঢ়তাসূচক ভাষায় ব্যক্ত করে থাকেন; বরং আমরা তাঁদেরকে প্রায়শ নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে এ কথা বলতে দেখতে পাই যে, هذا أحوط (এটা অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা), هذا أصحّ (এটা অধিকতর বিশুদ্ধ), هذا أحسن (এটা অধিকতর উত্তম), هذا أولى (এটা অধিকতর উপযোগী), هذا ما ينبغي (এটা সমীচীন), نكره هذا (এটা আমরা অপছন্দ করি), لايعجبني (এটা আমার পছন্দনীয় নয়) প্রভৃতি। বিশিষ্ট সাহাবীগণের নিয়ম ছিল যে, তাঁরা যখনই কোনো বিষয়ে নিজের রায় ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে কোনো ফাতওয়া দিতেন, তখন বলতেন:

> إن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأ فمنّي ومن الشّيطان؛ والله ورسوله منه بريء
>
> "যদি তা সঠিক হয়, তবেই তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি ভুল হয়, তবে তা আমার ও শায়তানের পক্ষ থেকে এবং তা থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দায়মুক্ত।"[২৯]

একবার ইমাম মালিক রহ.কে সাহাবী কিরাম রহ.-এর মতপার্থক্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন তিনি জবাব দেন, خطأ وصواب، فانظر في ذلك. "তাঁদের ইজতিহাদ ভুলও হতে পারে এবং সঠিকও হতে পারে। কাজেই তাঁদের (ইজতিহাদভিত্তিক) মতের মধ্যে চিন্তা-ফিকর করো।"[৩০] ইমাম মালিক রহ. নিজের ইজতিহাদ সম্পর্কে অকুণ্ঠ চিত্তে বলেন:

> إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئ وَأُصِيبُ، فَانْظُرُوا في رَأْيِي؛ فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوهُ، وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ.
>
> "আমি নিছক একজন মানুষ। ভুলও করতে পারি, ঠিকও করতে পারি। অতএব, তোমরা আমার মত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখবে। যদি দেখো যে, আমার

---

২৯. এ উক্তি করেছেন সাইয়িদুনা আবূ বাক্‌র (দ্র. দারিমী, *আস-সুনান*, হা. নং: ২৯৭২; বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হা. নং: ১২৬২৯), 'উমার (দ্র. বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হা. নং: ২০৮৪৫; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, হা. নং: ২৭৩৭) ও 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (দ্র. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হা. নং: ২১১৮; দারাকুতনী, *আস-সুনান*, হা. নং: ১৬৫; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা. নং: ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৫) এ ছাড়াও অন্যান্য অনেকের থেকেও অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত রয়েছে।

৩০. হুমাইদী, *জাযওয়াতুল মুকতাবাস...*, (http://www.alwarraq.com), পৃ. ২৯; ইবনু হাযম, *আল-ইহকাম*, খ. ৬, পৃ. ৩১৭

কোনো মত কুর'আন ও হাদীসের সাথে পুরো সঙ্গতিপূর্ণ, তবেই তা গ্রহণ করো। আর যদি দেখো যে, আমার কোনো মত কুর'আন ও সুন্নাহর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তা হলে তোমরা তা ছেড়ে দেবে।"[৩১]

ইমাম আবুল বারাকাত আন-নাসাফী আল-হানাফী [মৃ. ৭১০ হি.] রহ. বলেন:

إِذَا سُئِلْنَا عَنْ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ مُخَالِفِنَا قُلْنَا وُجُوبًا: مَذْهَبُنَا صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَمَذْهَبُ مُخَالِفِنَا خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ. وَإِذَا سُئِلْنَا عَنْ مُعْتَقَدِنَا وَمُعْتَقَدِ خُصُومِنَا. قُلْنَا وُجُوبًا الْحَقُّ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ وَالْبَاطِلُ مَا عَلَيْهِ خُصُومُنَا.

"আমাদের ও আমাদের প্রতিপক্ষের ফিকহী মাযহাব সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসা করা হলে আমরা অবশ্যাম্ভাবীরূপে বলবো, আমাদের মাযহাবই সঠিক, তবে ভুল হবারও সম্ভাবনা রয়েছে। আর আমাদের প্রতিপক্ষের মাযহাব ভুল, তবে সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। কিন্তু আমাদের ও আমাদের প্রতিপক্ষের 'আকীদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে অবশ্যাম্ভাবীরূপে বলবো যে, আমাদের 'আকীদাই সঠিক এবং প্রতিপক্ষের 'আকীদা ভ্রান্ত।"[৩২]

অর্থাৎ ফিকহী ইজতিহাদের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতার সুনিশ্চিত দাবি করা সম্ভব নয়। কেননা সেক্ষেত্রে অনেক সময় প্রমাণাদি হয় প্রচ্ছন্ন, দ্ব্যর্থবোধক কিংবা দুর্বল। পক্ষান্তরে 'আকীদার ক্ষেত্রে প্রমাণাদি হচ্ছে স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন ও শক্তিশালী। সুতরাং এতে ভিন্নমতের কোনোই অবকাশ নেই। ইমাম নাসাফী রহ.-এর উপর্যুক্ত কথার ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট হানাফী ফাকীহ ইবনু 'আবিদীন [১১৯৮-১২৫২ হি.] রহ. বলেন:

فَلا نَجْزِمُ بِأَنَّ مَذْهَبَنَا صَوَابٌ أَلْبَتَّةَ وَلا بِأَنَّ مَذْهَبَ مُخَالِفِنَا خَطَأٌ أَلْبَتَّةَ، بِنَاءً عَلَى الْمُخْتَارِ مِنْ أَنَّ حُكْمَ اللَّهِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ وَاحِدٌ مُعَيَّنٌ وَجَبَ طَلَبُهُ. فَمَنْ أَصَابَهُ فَهُوَ الْمُصِيبُ وَمَنْ لا فَهُوَ الْمُخْطِئُ.

"আমরা একথা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি না যে, আমাদের মাযহাবই অবশ্যাম্ভাবীরূপে সঠিক এবং আমাদের প্রতিপক্ষের মাযহাব অবশ্যাম্ভাবীরূপে ভুল। কেননা পছন্দনীয় মত হলো- প্রতিটি মাস'আলায় আল্লাহ তা'আলার বিধান একটিই এবং তা সুনির্দিষ্ট, যা অনুসন্ধান করে বের করা ওয়াজিব। কাজেই যিনি উক্ত একক ও সুনির্দিষ্ট বিধানটি সঠিকভাবে আহরণ করতে সমর্থ হবেন, তিনিই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত। পক্ষান্তরে যিনি উক্ত একক ও সুনির্দিষ্ট বিধানটি সঠিকভাবে আহরণ করতে সমর্থ হননি, তিনি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত।"[৩৩]

---

৩১. ইবনু হায্ম, *আল-ইহকাম*, খ. ৬, পৃ. ৭৯০; বাদরুদ্দীন আয-যারকাশী, *আল-বাহরুল মুহীত* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০০ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ২০০

৩২. ইবনু নুজাইম, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযা'য়ির* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৩৮১; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, (http://www.al-islam.com), খ. ১, পৃ. ১১৫

৩৩. *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১১৬

মুফতী ইবনু মুল্লা ফাররূখ আল-হানাফী [মৃ. ১০৫২ হি.] রহ. বলেন:

الكل كانوا في طلب الحق على حد متساو واجتهاد كل واحد منهم يحتمل الخطأ كغيره بعد تسليم بلوغهم درجة الاجتهاد وإن تفاوتوا فيه

"সকলেই তাঁরা সমানভাবে সত্যানুসন্ধানে রত ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই ইজতিহাদ ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। এটা স্বীকার্য যে, তাঁরা প্রত্যেকেই ইজতিহাদের মর্যাদা লাভ করেছেন, যদিও তাঁদের মধ্যে যোগ্যতাগত পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে।"[৩৪]

ইমাম ইবনু আমীরিল হাজ্জ আল-হানাফী [মৃ. ৬৬৯-৭৩৩ হি.] রহ. বলেন:

إن رأيه يحتمل الخطأ وإن كان الظاهر عنده أنه الصواب ورأي غيره يحتمل الصواب وإن كان الظاهر عنده خطأه

"তাঁর (ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর) অভিমতও ভুল হবার সম্ভাবনা রাখে, যদিও তা বাহ্যত তাঁর নিকট সঠিক এবং অপরদিকে অন্যের মত সঠিক হবার সম্ভাবনা রাখে, যদিও তা বাহ্যত তাঁর নিকট ভুল।"[৩৫]

খালীফা হারূনুর রাশীদ ইমাম মালিক রহ.-এর নিকট থেকে 'মুওয়াত্তা' শোনে আরয করলেন, আমি একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। ইমাম মালিক রহ. বললেন, সিদ্ধান্তটি কী? খালীফা বললেন, আমি মুওয়াত্তাটি কা'বার গাত্রে ঝুলিয়ে দেবো এবং প্রত্যেক দেশেই এর এক একটি কপি পাঠিয়ে দেবো। তদুপরি উম্মাতের ঐক্যের স্বার্থে সকলকে এটা মেনে চলতে এবং এ ছাড়া অন্য মাযহাব ত্যাগ করতে নির্দেশ দেবো। সম্মানিত পাঠক ভাইয়েরা, লক্ষ্য করুন! খালীফা হারূনুর রাশীদের এ আরযের জবাবে ইমাম মালিক রহ. কী বললেন! তিনি জবাব দিলেন, "না, আমীরুল মু'মিনীন! এ জাতীয় কোনো কাজ করবেন না।" খালীফা জানতে চাইলেন, কেন? ইমাম মালিক রহ. বললেন:

إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأمصار، وحدث كل بما سمع من رسول الله، واستقر عمل كل مصر على ما بلغهم عن رسول الله، فلا تغير على الناس ما هم عليه.

"রাসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবীগণ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে গেছেন এবং তাঁরা প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট থেকে যা শুনেছেন তা-ই বর্ণনা করেছেন। উপরন্তু, প্রত্যেকে দেশের 'আমাল সে-ই অবস্থার ওপরই স্থিতিশীলতা লাভ করেছে, যা

---

৩৪. ইবনু মুল্লা ফাররূখ, *আল-কাওলুস সাদীদ ফী বা'দি মাসা'য়িলিল ইজতিহাদ ওয়াত তাকলীদ* (কুয়েত: দারুদ দা'ওয়াহ, ১৯৮৮), পৃ. ৫০-৫১

৩৫. ইবনু আমীরিল হাজ্জ, *আত-তাকরীরু ওয়াত তাহবীরু ফী 'ইলমিল উসূল* (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৯৬খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৪৪২

রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট থেকে তাদের কাছে পৌঁছেছে। কাজেই আপনি লোকদেরকে তাদের স্ব স্ব অবস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করবেন না।"[৩৬]

এখানে লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো, ইমাম মালিক রহ.-এর সাথে অনেক বিষয়ে অন্যান্য ইমামের মতানৈক্য রয়েছে- কিন্তু খালীফা যখন তাঁর মাযহাবটি রাষ্ট্রীয়ভাবে সর্বত্র চালু করতে ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন তিনি তাতে সম্মত হলেন না; বরং তিনি লোকদেরকে তাদের স্ব স্ব অবস্থানের ওপর বহাল রাখতে নির্দেশ দিলেন।

খ. অপরের মতকে শ্রদ্ধা করা

মুজতাহিদ ইমামগণ কুর'আন ও হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি- এরূপ ইজতিহাদ ও গবেষণাধর্মী বিষয়গুলো নিয়ে পরস্পর মতবিরোধ করেছেন; কিন্তু এ মতবিরোধের কারণে তাঁদের মধ্যে কখনো দেখা দেয়নি দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও বিভাজন। বরং তাঁরা একে অপরের মত ও ইজতিহাদকে সমীহ করতেন। সাহাবী, তাবি'ঈ ও তাঁদের পরবর্তী ইমামগণের মধ্যে অনেকেই নামাযের মধ্যে বিসমিল্লাহ পড়তেন, আবার অনেকেই পড়তেন না; কেউ তা উচ্চস্বরে পড়তেন, আবার কেউ অনুচ্চস্বরে পড়তেন; কেউ ফাজরের নামাযের মধ্যে কুনূত পড়তেন, আবার কেউ পড়তেন না; কেউ রক্তমোক্ষণ ও নাক থেকে রক্তক্ষরণের কারণে অযু করতেন, আবার কেউ অযু করতেন না; কেউ পুরুষাঙ্গ ও কামভাবসহকারে নারীকে স্পর্শ করার কারণে অযু করতেন, আবার কেউ অযু করতেন না; কেউ আগুনে সিদ্ধ খাবার খেলে অযু করতেন, আবার কেউ করতেন না; কেউ উটের গোশত খেলে অযু করতেন, আবার কেউ করতেন না। এতদসত্ত্বেও তাঁরা একজন অপরজনের পেছনে নামায পড়তেন। যেমন- ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর শিষ্যগণ, অনুরূপভাবে ইমাম শাফি'ঈ ও তাঁর অনুসারী ফাকীহগণ মাদীনাবাসী মালিকী মতাবলম্বী ও অন্যান্য ইমামগণের পেছনে নামায পড়তেন, যদিও বা তাঁরা আদপেই নামাযে বিসমিল্লাহ পড়তেন না, না অনুচ্চস্বরে, না উচ্চস্বরে।[৩৭]

নিম্নে উদাহরণস্বরূপ এরূপ কয়েকটি ঘটনা আলোচনা করা হলো-

খ.১. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.-এর মতে, নাক থেকে রক্তক্ষরণ হলে কিংবা রক্তমোক্ষণ করলে অযু ভেঙ্গে যায়। তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, যাদের মাযহাবে এরূপ অবস্থায় অযু ভাঙ্গে না, তাদের পেছনে কী আপনি নামায পড়বেন?

৩৬. 'আতিয়্যাহ, *শারহুল আরবা'ঈন লিন-নাবাবী,* (http://www.islamweb.net), পৃ. ৭

৩৭. শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *আল-ইনসাফ* (বৈরূতঃ দারুন নাফা'য়িস, ১৪০৪ হি.), পৃ. ১১০ ও *হুজ্জাতুল্লাহু বালিগাহ* (কায়রোঃ দারুল কুতুবিল হাদীছাহ), পৃ.৩৩৫; ইবনু মুল্লা ফাররূখ, *আল-কাওলুস সাদীদ*, পৃ. ১৪০-২

জবাবে তিনি বললেন, كيف لا أصلي خلف الامام مالك وسعيد بن المسيب "কেন নয়? ইমাম মালিক ও ইমাম সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রহ. প্রমুখের পেছনে কেন নামায পড়বো না?!"[৩৮] উল্লেখ্য যে,তাঁদের মাযহাব মতে, এরূপ অবস্থায় অযু ভঙ্গ হয় না।

খ. ২. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.-এর মতে, উটের গোশত খেলে অযু ভেঙ্গে যায়। তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কী ইমাম শাফি'ঈ রহ.-এর পেছনে নামায পড়বেন, যদি তিনি উটের গোশত খেয়ে নামাযে দাঁড়ান? জবাবে তিনি বললেন, وكيف لا أصلي خلف الشافعي وخلف مالك بن أنس وخلف فلان وفلان؟! "কেন নয়? ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম মালিক এবং অন্যান্য ইমামের পেছনে কেন নামায পড়বো না?!"[৩৯]

ইমাম আহমাদ রহ.-এর উপর্যুক্ত বক্তব্যগুলো থেকে দুটি বিষয় জানা যায়।

এক. কোনো মাযহাবই ভ্রান্ত নয়। কেননা, সকল মুজতাহিদের মাযহাব ও ইজতিহাদের মূল দলীল হচ্ছে কুর'আন, হাদীস ও কিয়াস।

দুই. পরস্পরের মতামত ও ইজতিহাদের প্রতি ইমামগণের শ্রদ্ধাবোধ ছিল পুরোমাত্রায় এবং প্রত্যেকেই একে অপরকে সত্যের একনিষ্ঠ অনুসারী মনে করতেন।

খ.৩. ইমাম শাফি'ঈ রহ. একবার ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর কাবরের নিকট ফাজরের নামায আদায় করেন। তাঁর মতে, ফাজরের নামাযে দু'আ কুনূত পড়া আবশ্যক হলেও তিনি এই বলে কুনূত পড়া বাদ দেন যে, এই কাব্‌রবাসী ইমাম ফাজরের নামাযে কুনূত পড়তেন না। তাই আমি আজ তাঁর প্রতি আদব রক্ষা করতে চাই।[৪০] তিনি আরো বলেন, ربما انحدرنا الى مذهب أهل العراق "কখনো আমরা ইরাকবাসীদের অনুসৃত মাযহাবের দিকে নেমে আসি।"[৪১] অনেকের মতে, সেদিন তিনি উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়েননি। কেননা, আবূ হানীফা রহ. অনুচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়তেন।[৪২]

খ.৪. একবার ইমাম আবু ইউসূফ রহ. হাম্মামখানায় গোসল করে জুমু'আর নামাযের ইমামতি করলেন। নামাযের অনেক পরে জানা গেলো যে, হাম্মাম খানার কুপের মধ্যে একটি ইঁদুর মৃতাবস্থায় পড়ে আছে। হানাফী মাযহাব মতে, এ অবস্থায় পানি অপবিত্র বিধায় নামায পুনরাবৃত্তি করা দরকার; কিন্তু লোকজন চলে যাওয়ায় তা সম্ভব ছিল না।

৩৮. শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *আল-ইনসাফ*, পৃ. ১১০ ও *হুজ্জাতুল্লাহু বালিগাহ*, পৃ. ৩৩৫; ইবনু মুল্লা ফাররূখ, আল-কাওলুস সাদীদ, পৃ. ১৪২

৩৯. 'আতিয়্যাহ, *শারহুল আরবাঈন,* পৃ. ৬, ১২

৪০. শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *আল-ইনসাফ*, পৃ. ১১০ ও *হুজ্জাতুল্লাহু বালিগাহ*, পৃ. ৩৩৫

৪১. প্রাগুক্ত

৪২. মুহাম্মাদ যাকারিয়া, *আওজাযুল মাসালিক*, খ. ১, পৃ. ১০৩

তখন তিনি বললেন:

إذا نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا -

“এ মুহূর্তে আমরা আমাদের মাদানী ভাইদের মত অনুসরণ করবো। তাঁদের মতে, দু মটকা পরিমাণ পানিতে নাপাক পড়লে তা অপবিত্র হয় না।”[৪৩]

লক্ষ্য করার বিষয় হলো, ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. মাদীনার ইমাম মালিক রহ. ও তাঁর অনুসারীগণকে ভাই বলে বোঝাতে চাইলেন যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা উভয় পক্ষই কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইজতিহাদ করেছি এবং নিজ নিজ চিন্তা ও ইজতিহাদ মুতাবিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। সুতরাং আমরা সকলেই হকের ওপর রয়েছি। যেহেতু আমাদের উভয় পক্ষের উৎস কুরআন ও হাদীস, তাই আমরা একই মায়ের দুটি সন্তান তুল্য। আরো লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো, একজন মুজতাহিদের জন্য সংকটকালে অন্য ইমামের মতের ওপর ‘আমাল করার যে সুযোগ রয়েছে, আলোচ্য ঘটনা তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাছাড়া একাধিক মাযহাবের উপস্থিতি সংকটকালে শারী‘আতের ওপর ‘আমাল করার ক্ষেত্রে যে প্রশস্ততা ও সহজতা এনে দেয়, তাও এ ঘটনা থেকে জানা যায়।

গ. দলীল পাওয়া গেলে নিজের অবস্থান প্রত্যাহার করা

মুজতাহিদ ইমামগণ যদিও নানা বিষয়ে পরস্পর মতবিরোধ করেছেন; কিন্তু তাঁদের এ মতবিরোধের পেছনে তাঁদের একান্ত উদ্দেশ্য ছিল সত্যকে খোঁজে বের করা। এ ক্ষেত্রে কোনোরূপ স্বার্থপরতা ও হঠকারিতা তাঁদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। যখনই তাঁদের মতের বিপরীত কোনো সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ দলীল পেতেন, তখনই তাঁরা প্রসন্নচিত্তে নিজের মত পরিত্যাগ করে প্রাপ্ত দলীল অনুযায়ী মত পরিবর্তন করে নিতেন। বিশিষ্ট তাবি‘ঈ তা’ঊস [৩৩-১০৬ হি.] রহ. বলেন, رُبَّمَا رَأَى ابْنُ عَبَّاس الرَّأْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ “ইবনু ‘আব্বাস অনেক সময় (ক্ষেত্রবিশেষে) একটি মত পোষণ করতেন। কিছু দিন পর দেখা যেতো, তিনি ঐ মতটি ত্যাগ করেছেন।”[৪৪] *‘হিদায়াহ’* গ্রন্থের বিশিষ্ট ভাষ্যকার ইবনুশ শিহ্‌নাহ আল-হালাবী আল-হানাফী [৭৪৯-৮১৫হি.] রহ. বলেন:

إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ وَكَانَ عَلَى خلاف الْمَذْهَبِ عُمِلَ بِالْحَدِيثِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مَذْهَبَهُ وَلا يَخْرُجُ مُقَلِّدُهُ عَنْ كَوْنِهِ حَنَفِيًّا بِالْعَمَلِ بِهِ.

“যদি মাযহাবের বিপরীত কোনো বিশুদ্ধ হাদীস পাওয়া যায়, তবে হাদীস অনুযায়ীই ‘আমাল করা হবে। অধিকন্তু ঐ হাদীসটিই হবে ইমাম আবূ হানীফা

৪৩. ইবনু ‘আবিদীন, *প্রাগুক্ত,* খ. ১, পৃ. ১৮৯; আবূ সা‘ঈদ আল-খাদিমী, *বারীকাতুন মাহমূদিয়াতুন...,* (http://www.al-islam.com), খ. ৬, পৃ. ৩৩৪-৫; শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *আল-ইনসাফ,* পৃ. ১০৯; ইবনু মুল্লা ফাররূখ, *আল-কাওলুস সাদীদ,* পৃ. ১০৪

৪৪. দারিমী, *আস-সুনান,* আল-মুকাদ্দামাহ, পরিচ্ছেদ: ইখতিলাফুল ফুকাহা’, হা. নং: ৬৩০

রহ.-এর মাযহাব এবং ঐ হাদীসের মর্মানুযায়ী ‘আমালকারী ব্যক্তি হানাফী মাযহাব থেকে বহির্ভূত হবে না।”[৪৫]

ইমাম আবূ হানীফাহ রহ.-এর মতেও, যদি কোনো বিষয়ে তাঁর ফায়সালার বিপরীত কোনো বিশুদ্ধ হাদীস পাওয়া যায়, তা হলে তাঁর ফায়সালা ছেড়ে হাদীসের মর্মানুযায়ী ‘আমাল করতে হবে। তিনি বলেছেন যে, إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي. “যদি হাদীস বিশুদ্ধ হয়, তবে তা-ই হবে আমার মাযহাব।”[৪৬] ইমাম শাফি‘ঈ রহ.ও বলেন, وَإِذَا صَحَّ الحَدِيْثُ، فَاضْرِبُوا بِقَولِي الحَائطَ. “যদি হাদীস সাহীহ হয়, তা হলে তোমরা আমার কথাকে দেওয়ালে নিক্ষেপ করো।”[৪৭] নিম্নে উদাহরণস্বরূপ ইমামগণের নিজের মত থেকে ফিরে আসার কয়েকটি ঘটনা আলোচনা করা হলো-

গ. ১. ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ফাতওয়া হলো, কোনো জিনিস ওয়াক্‌ফ করার পর সেটা তার ওপর আবশ্যক হয়ে যায় না; বরং সে যে কোনো সময় ওয়াক্‌ফকৃত জিনিস ফিরিয়ে নিতে পারে। অবশ্যই যদি সেটা অসিয়্যাতের পর্যায়ের হয় কিংবা শরয়ী কাযীর পক্ষ থেকে ফায়সালাকৃত হয়, তখন আর ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার থাকবে না। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর এ ফাতওয়া ছিল জুমহুর ইমামগণের পরিপন্থী এবং সাহীহ হাদীসের[৪৮] বিপরীত। এর কারণ, হয়তো তাঁর

৪৫. ইবনু ‘আবিদীন, *প্রাগুক্ত,*খ. ১, পৃ. ১৬৬

৪৬. *প্রাগুক্ত*

৪৭. যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮), পৃ. ১৬৫; ইবনুল ‘ইমাদ, *শাযারাতুয যাহাব* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যাহ), খ. ৪, পৃ. ৯৯

৪৮. হাদীসটি হলো-

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان يقال له ثمغ وكان نخلا فقال عمر يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به فقال النبي صلى الله عليه و سلم (تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره). فتصدق به عمر فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو أن يؤكل صديقه غير متمول به .

“ইবনু ‘উমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স.-এর সময় ‘উমার রা. নিজের কিছু সম্পত্তি সাদাকাহ করেছিলেন। তা ছিল, ছাম্‌গ নামে একটি খেজুর বাগান। ‘উমার রা. বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একটি সম্পদ পেয়েছি, যা আমার নিকট খুবই পছন্দনীয়। আমি এটা সাদাকাহ করতে চাই। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, মূল সম্পত্তিটি এ শর্তে সাদাকাহ করো যে, তা বিক্রি করা যাবে না, দান করা যাবে না এবং কেউ ওয়ারিশও হবে না; বরং তার ফল (আল্লাহর পথে) দান করা হবে। তারপর ‘উমার রা. সে সম্পত্তিটি সেভাবে সাদাকাহ করলেন। তাঁর এ সাদাকাহ ব্যয় হবে আল্লাহর রাস্তায়, দাস মুক্তির ব্যাপারে, মিসকীন, মেহমান, মুসাফির ও আত্মীয়দের জন্য। এর যে মুতাওয়াল্লী হবে তার জন্য তা থেকে সঙ্গত পরিমাণ আহার করলে কিংবা বন্ধুবান্ধবদের খাওয়ালে কোনো দোষ নেই। তবে সে তা সঞ্চয় করতে পারবে না।” (বুখারী, *আস-সাহীহ,* অধ্যায়: আল-ওসায়া, হা. নং: ২৬১৩)

নিকট এতদসংক্রান্ত হাদীসটি পৌঁছেনি। ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. ও প্রথমদিকে তাঁর উস্তাদ ইমাম আবূ হানীফাহ রহ.-এর ন্যায় মত পোষণ করতেন। কিন্তু যখন তিনি হাদীসটি সম্পর্কে অবগত হলেন এবং মাদীনায় লোকদেরক তাঁদের জায়গা-সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করতে দেখলেন, তখন তিনি নিজের মত থেকে ফিরে আসেন এবং পরিষ্কার ভাষায় বলেন যে, ‘‘এমন স্পষ্ট ও সাহীহ হাদীসের বিপরীত মত পেশ করার অধিকার কারো নেই। ইমাম আবূ হানীফাহ রহ. ও এ হাদীস পেলে বিপরীত মত পোষণ করতেন না।’’[৪৯]

গ.২. একবার ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. খালীফা হারূনুর রাশীদের সাথে মাদীনায় আসেন এবং ইমাম মালিক রহ.-এর সাথে সাক্ষাত করেন। এ সময় সা’-এর পরিমাণ নিয়ে দুজনের মধ্যে আলোচনা হয়। ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. ইমাম মালিক রহ. কে উদ্দেশ্য করে বললেন, সা’-এর পরিমাণ কতো? তিনি জবাব দেন, আমাদের নিকট সা’-এর পরিমাণ হলো- পাঁচ সমস্ত তিনভাগের এক রিতল। ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. বলেন, কিন্তু আমাদের নিকট হলো- সা’ হলো আট রিতল। আমাদের ইমাম আবূ হানীফাহ রহ. এরূপ মতই ব্যক্ত করেছেন। তখন ইমাম মালিক রহ. সভায় উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যে যার কাছে রাসূলুল্লাহ স.-এর সময় থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে -এরূপ কোনো সা’ বিদ্যমান রয়েছে সে যেন তা আগামীকাল নিয়ে আসে। পরদিন প্রত্যেকেই নিজের চাদরের নিচে এক একটি সা‘ নিয়ে এসে হাজির হলো এবং কেউ বললো, আমার মা তার নানী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা এ সা‘ দিয়ে রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতেন, আবার কেউ বললো, আমার পিতা আমার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, আবার কেউ বললো, আমার চাচা আমার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, আবার কেউ বললো, আমার মামা অমুক থেকে বর্ণনা করেছেন।... এভাবে সেদিন ইমাম মালিক রহ.-এর নিকট প্রায় ৫০টি সা‘ জমা পড়লো। ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. বললেন, আমি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখলাম, সা‘গুলো প্রায় একই মাপের। আমি তন্মধ্য থেকে একটি সা‘ নিয়ে বাজারে গেলাম এবং তা মেপে তার পরিমাণ পাঁচ সমস্ত তিনভাগের এক রিতল পেলাম। এরপর আমি ইরাকে ফিরে আসি এবং ইরাকবাসীকে লক্ষ্য করে বললাম, আমি তোমাদের নিকট একটি নতুন তথ্য নিয়ে এসেছি। লোকেরা বললো, সে নতুন তথ্যটি কী? তিনি বললেন, মাদীনাতুর রাসূলে সা‘-এর পরিমাণ হলো পাঁচ সমস্ত তিনভাগের এক রিতল। লোকেরা বললো, তাহলে তো তুমি জনপদের শায়খ অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর বিরোধিতা করলে?! ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. বললেন, মাদীনায় আমি এমন বিষয় দেখতে পেলাম, যার বিরোধিতা

৪৯. তাকী উছমানী, *মাযহাব কি ও কেন?* (ঢাকা: মোহাম্মদী বুক হাউস, তা. বি.), পৃ.১৭৫-৬

করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বর্তমান অবধি এ সংক্রান্ত হানাফীগণের মত হলো- ইমাম আবূ ইউসূফের দৃষ্টিতে সা‘-এর পরিমাণ হলো- পাঁচ সমস্ত তিনভাগের এক রিতল, আর ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম যুফার রহ. প্রমুখের মতে- আট রিতল।[৫০]

ইমাম আবূ ইউসূফ রহ.-এর এ ঘটনা দুটিতে লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো, ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. নিজের ইমামের মতের অন্ধ অনুকরণ করে বসে থাকেননি; বরং সাহীহ হাদীস ও দলীল পাওয়া মাত্রই নিজ ইমামের মত প্রত্যাখ্যান করে সাহীহ হাদীসের ওপরই ‘আমাল করেছেন। শুধু তাই নয়; বরং সাথে সাথে স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, ইমামের মতের কারণে হাদীস ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। ইমাম আবূ হানীফাহ রহ. নিজেও শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, আমার কোনো মত যদি কোনো সাহীহ হাদীসের পরিপন্থী বলে প্রমাণিত হয়, তবে তোমরা হাদীসকে গ্রহণ করে আমার মতকে উপেক্ষা করবে।

গ.৩. ইমাম শাফি‘ঈ রহ.-এর দুটি মাযহাব রয়েছে। একটি হলো: ‘কাদীম’ (পুরাতন)। এটি তাঁর পুরাতন মাযহাব, যা তিনি বাগদাদে অবস্থানকালে পোষণ করতেন এবং এ মাযহাবের মতগুলো তিনি হিজরী ১৯৫ সালে তাঁর কিতাব ‘আল-হুজ্জাত’-এ লিপিবদ্ধ করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি এ মাযহাবের অধিকাংশ মত থেকে ফিরে আসেন এবং এগুলো দ্বারা ফাতওয়া দেওয়া বন্ধ করে দেন। তাঁর এ মাযহাবের মধ্যে সাধারণত মালিকী মাযহাবের মতগুলোর ছাপই বেশি পরিলক্ষিত হয়। তাঁর অপর মাযহাবটি হলো ‘জাদীদ’ (নতুন)। এটি তিনি মিসরে অবস্থানকালে তাঁর পুরাতন মাযহাবের বিপরীতে প্রবর্তন করেন এবং এ মাযহাবের মতগুলো তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব ‘আল-উম্ম’-এ লিপিবদ্ধ করেন। উত্তরকালে এটিই তাঁর মাযহাব হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শাফি‘ঈ মতাবলম্বী ইমামগণ সকলেই এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন, যদি কোনো মাস’আলায় ইমাম শাফি‘ঈ রহ.-এর দুটি অভিমত পাওয়া যায়, একটি পুরাতন ও অপরটি নতুন, তা হলে তাঁর নতুন অভিমতটিই গৃহীত হবে। তাঁর পুরাতন মতটি গ্রহণ করা যাবে না। এটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।[৫১] ইমাম শাফি‘ঈ রহ. নিজেও বলেন, لیس في حلٍّ من رَوَى عَنِّي الْقَدِيمَ ‘‘আমার নিকট থেকে ‘কাদীম’ মত বর্ণনাকারীগণ স্বাধীন নন।’’[৫২] অর্থাৎ তাঁদের জন্য এটা বর্ণনা করা বৈধ নয়।

৫০. ‘আতিয়্যাহ, *শারহুল আরবাঈন*, পৃ. ৭

৫১. তবে ১৭টি মাস’আলা এর ব্যতিক্রম। এ মাস’আলাগুলোতে তাঁর শিষ্যগণ তাঁর কাদীম মতানুসারে ফাতওয়া দিয়েছেন।

৫২. যারকাশী, *আল-বাহরুল মুহীত*, খ. ৪, পৃ. ৫৭৪

উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফি'ঈ রহ.-এর এ মাযহাব পরিবর্তনের প্রধান কারণ হলো, তিনি জীবনের শেষ অধ্যায়ে এমন অনেক হাদীস অবগত হন, যা তাঁর পক্ষে জীবনের প্রথম দিকে অর্জন করা সম্ভব হয়নি।[৫৩] তা ছাড়া তিনি আরব, মিসর ও বাগদাদের সার্বিক অবস্থার মধ্যেও বহু পার্থক্য দেখতে পান। বলাই বাহুল্য, ক্ষেত্রবিশেষে সময়, স্থান ও অবস্থাভেদে হুকমের মধ্যেও ভিন্নতা তৈরি হয়।[৫৪] ফলে তাঁর নিকট যে মতগুলো তাঁর পরবর্তীকালে অর্জিত হাদীসের পরিপন্থী বলে প্রতীয়মান হয়েছে এবং তাঁর যে ইজতিহাদগুলো অবস্থা ও সময়োযোগী মনে হয়নি, তিনি সে মত ও চিন্তাগুলো অবলীলায় ত্যাগ করেন এবং হাদীসের মর্ম, অবস্থা ও সময়ের দাবি অনুযায়ী নতুন মত গ্রহণ করেন।

ঘ. গবেষণাধর্মী বিষয়ে ভিন্নরূপ 'আমালকারীকে খারাপ মনে না করা

মুজতাহিদ ইমামগণ যদিও বিভিন্ন বিষয়ে নিজস্ব চিন্তা ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে মতপার্থক্য করেছেন; কিন্তু তাঁরা কখনো তাঁদের মতের ভিন্নরূপ 'আমালকারীকে খারাপ জানতেন না। সুফইয়ান আছ-ছাওরী [৯৭-১৬১ হি.] রহ. বলেন, إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه "মতপার্থক্যপূর্ণ ক্ষেত্রে কাউকে তোমার মতের বিপরীত 'আমাল করতে দেখলে তাকে বাঁধা দিয়ো না।"[৫৫]

তিনি আরো বলেন, ما اختلف فيه الفقهاء، فلا أنهى أحدا من إخواني أن يأخذ به "ফাকীহদের মতবিরোধ রয়েছে- এমন ক্ষেত্রে কোনো ভাইকে আমি যে কোনো মত গ্রহণে বাঁধা দেই না।"[৫৬]

সুফইয়ান আছ-ছাওরী রহ.-এর উপর্যুক্ত দুটি মন্তব্য থেকে তাঁর এ কর্মনীতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, তিনি নিজে একজন উঁচু মাপের মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য

৫৩. যেমন মোজার ওপর মাসহের সময়সীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত হাদীসগুলো। ইমাম শাফি'ঈ রহ. ইরাকে থাকা কালে ইমাম মালিক রহ.-এর মতো মোজার ওপর মাসহের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা না থাকার পক্ষে ফাতওয়া দেন। পরবর্তীতে তিনি মিসরে এসে এতদসংক্রান্ত হাদীসগুলো পাওয়ার পর তাঁর পুরাতন মত ত্যাগ করেন এবং মুকীমের জন্য একদিন একরাত এবং মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত সময় নির্ধারণ করে ফাতওয়া দেন। [ইবনু 'আবদিল বার্‌র, *আল-ইস্তিযকার* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২২১; নাবাবী, *শারহুল মুহাযযাব* (বৈরূতঃ দারুল ফিকর), খ. ১, পৃ. ৫৪৫]

৫৪. যেমন ইমাম শাফি'ঈ রহ. মিসরে এসে দেখতে পেলেন যে, এখানকার চামড়া শিল্প অনেক উন্নত এবং এটি মিসরের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রেখে চলেছে, যা তিনি হিজাযে দেখতে পাননি। ফলে তিনি এতদসংক্রান্ত তাঁর পুরাতন মত ত্যাগ করে প্রক্রিয়াজাত চামড়া বিক্রির পক্ষে নতুন ফাতওয়া দেন। (মুরাগশালী, *ইখতিলাফুল ইজতিহাদ ওয়া তাগাইয়ুরুহু ...,* পৃ. ৩৮৪)

৫৫. আবূ নু'আইম, *হিলয়াতুল আউলিয়া* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'আরবী, ১৪০৫ হি.), খ. ৬, পৃ. ৩৬৮; আল-খাতীব আল-বাগদাদী, *আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, খ. ২, পৃ. ৩৫৫

৫৬. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, *আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ,* খ. ২, পৃ. ৩৫৪

মুজতাহিদের মতকে না-হক মনে করতেন না। তদুপরি তাঁর 'ভাই' শব্দটি এখানে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এতে আমাদের জন্য শিক্ষা লাভের বহু উপকরণ নিহিত রয়েছে।

ইসলামী শারীআহের একটি সাধারণ মূলনীতি হলো, لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه "মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে বাধা দেওয়া যাবে না। কেবল সর্বসম্মত বিষয়ে বাধা দেওয়া যাবে।"[৫৭] ইমাম নাবাবী রহ. বলেন:

> ... ثم العلماء انما ينكرون ما أجمع عليه أما المختلف فيه فلا انكار فيه لان على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب.
>
> "আলিমগণ কেবল এমন সব ক্ষেত্রেই প্রতিবাদ করবেন, যেসব কাজ অন্যায় হওয়ার ব্যাপারে 'উলামা কিরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে বাঁধা দান করা বৈধ নয়। কেননা প্রত্যেক মাযহাবের মুজতাহিদই সঠিক।"[৫৮]

ইমাম গাযালী [মৃ. ১১১১ খ্রি.] রহ. বলেনঃ

> الشرط الرابع أن يكون كونه منكرا معلوما بغير اجتهاد فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب والضبع ومتروك التسمية ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه النبيذ الذي ليس بمسكر...
>
> "(অন্যায়ের প্রতিবাদ জানানোর ক্ষেত্রে) চতুর্থ শর্ত হলো কাজটি সর্বজন পরিচিত মন্দ কাজ হতে হবে এবং এর মন্দ হওয়াটা ইজতিহাদ নির্ভর হবে না। কাজেই যে কোনো কাজে মন্দ হওয়াটা ইজতিহাদ নির্ভর হলে তাতে বাঁধা দেওয়া যাবে না। যেমন কোনো হানাফী মতাবলম্বী ব্যক্তির এ অধিকার নেই যে, সে কোনো শাফি'ঈ মতাবলম্বীকে গুঁই সাপ, হায়েনা ও বিসমিল্লাহ ব্যতীত জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়ার ব্যাপারে বাঁধা দেবে। (কেননা এগুলো হানাফী মাযহাবে জায়িয না হলেও শাফি'ঈ মাযহাব মতে জায়িয।) অনুরূপভাবে শাফি'ঈ মতাবলম্বী ব্যক্তির এ অধিকার নেই যে, সে কোনো হানাফী মতাবলম্বীকে নেশা উদ্রেক করে না এরূপ নাবীয পান করার ব্যাপারে বাঁধা দেবে। (কেননা নাবীয শাফি'ঈ মাযহাবে জায়িয না হলেও হানাফী মাযহাব মতে জায়িয।) ..."[৫৯]

বিজ্ঞ ইমামগণের উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, অন্যায় কাজের প্রতিবাদের ক্ষেত্রে প্রতিবাদকারীকে অবশ্যই এ কথা জানতে হবে, তিনি যে বিষয় থেকে লোকদেরকে বারণ করছেন, তা নিঃসন্দেহে ইমামগণের সর্বসম্মতভাবে হারাম বা

৫৭. সুয়ূতী, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযা'য়ির* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৩ হি.), পৃ. ১৫৮ (কা'য়িদা নংঃ ৩৫)

৫৮. নাবাবী, *আল-মিনহাজু শারহু সাহীহি মুসলিম* (বৈরূতঃ দারু ইহয়াতিত তুরাছিল 'আরবী, ১৩৯২ হি.), খ. ২, পৃ. ২৩

৫৯. গাযালী, *ইহয়াউ 'উলূমুদ্দীন* (বৈরূতঃ দারুল মা'রিফাহ), খ. ২, পৃ. ৩২৫

মাকরূহ। ইমামগণ যেসব বিষয়ে হালাল-হারাম কিংবা জায়িয-নাজায়িয হবার ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন, সেসব বিরোধপূর্ণ বিষয়ে কাউকে নিজের মাযহাবের পরিপন্থী কাজ করতে দেখলে তাকে বাঁধা প্রদান করা সমীচীন নয়। যেমন- ধরুন, আপনি মাসজিদে নাবাবীতে বসে দীনী ইলম চর্চা করছেন। এ সময় আপনি দেখতে পেলেন যে, জনৈক ব্যক্তি সালাতুল 'আসরের পরে মাসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়ছেন। আর আপনি মনে করেন যে, সালাতুল 'আসরের পর কোনো নামায নেই। এ অবস্থায় যদি আপনি লোকটিকে কার্যত বাঁধা দিতে চান, তাহলে আপনাকে জানতে হবে যে, এ বিষয়ে সকল ইমামের মত কী? যদি আপনি জানতে পারেন যে, ইমাম শাফি'ঈ রহ.-এর মতে, সালাতুল 'আসরের পর নামায পড়া জায়িয, তাহলে আপনার জন্য নামাযরত লোকটিকে বাঁধা প্রদান করা সমীচীন হবে না। কেননা, সে তো এ কথা বলতে পারে যে, কী কারণে আমি নামায পড়বো না? হয়তো তখন আপনি বলবেন যে, তিনজন ইমামের মতে- এ সময় কোনো নামায নেই। আপনার এ কথা শুনে লোকটি আপনাকে বলতে পারে যে, আমি তো শাফি'ঈ মতাবলম্বী। তাঁর মতে, সালাতুল 'আসরের পরেও নামায পড়া যায়। আর তোমাদের মাযহাবগুলো আমার মাযহাবের চাইতে শ্রেষ্ঠ নয়। তখন হয়তো আপনি তাকে এতদসংক্রান্ত হাদীসটি বলবেন। কিন্তু সেও আপনাকে বলতে পারেন যে, এ সম্পর্কে অপর একটি হাদীস রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي "যখন তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করবে, সে যেন নামায পড়া ব্যতীত বসে না যায়।" এভাবে আপনি হয়তো এমন এক ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে যাবেন, যা বাঞ্ছনীয় নয়।

৬. ইমামগণের একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

মুজতাহিদ ইমামগণ যদিও একে অপরের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ করেছেন এবং যে কারণে তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন মাযহাবও গড়ে ওঠেছে। এতদসত্ত্বেও তাঁদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। তাঁরা একে অপরকে সম্মান করতেন এবং প্রত্যেকেই অপরের যোগ্যতার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিতেন। কেউ কাউকে নিজের মত গ্রহণ করার জন্য চেষ্টাও চালাননি এবং একে অপরের জ্ঞান ও দীনদারীর ওপর কোনোরূপ অভিযোগও আরোপ করেননি। অধিকন্তু, প্রত্যেকেই একে অপরের সশ্রদ্ধ প্রশংসা করেছেন। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ তাঁদের এরূপ কয়েকটি প্রসিদ্ধ মন্তব্য ও ঘটনা তুলে ধরছি।

৬.১. ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও তাঁর শিষ্যদের সাথে ইমাম শাফি'ঈ রহ.-এর মতপার্থক্যের কথা সর্বজন বিদিত। এ মতপার্থক্যের কারণে আলাদা দুটি মাযহাবের উদ্ভব হয়। এতদসত্ত্বেও তাঁদের মধ্যকার পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্পর্ক কেমন মধুর ছিল নিম্নে উল্লেখিত ইমাম শাফি'ঈ রহ. কয়েকটি মন্তব্য থেকে তা পরিস্ফুট হবে। তিনি ফিকহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফাহ রহ.-এর শ্রেষ্ঠত্বের অকুণ্ঠ

স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة رحمه الله "কেউ ফিকহ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে চাইলে তাকে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর শিষ্যত্ব বরণ করতেই হবে।"[৬০] তিনি আরো বলেন, الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. "লোকেরা ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর কাছে শিষ্যস্বরূপ।"[৬১] তিনি আরো বলেন, ما رأيت أحدا أفقه من أبي حنيفة. يعني ما علمت. "ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর চাইতে বিজ্ঞ কোনো ফাকীহ আমি দেখতে পাইনি।"[৬২] তিনি আরো বলেন, كان أبو حنيفة ممن وفق له الفقه "আবূ হানীফা ছিলেন ফিকহ শাস্ত্রে তাওফীক প্রাপ্তদের অন্যতম।"[৬৩]

এমনকি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর শিষ্যদের প্রতিও তিনি ছিলেন একান্ত শ্রদ্ধাশীল। তিনি বলেন:

> من أراد الفقه فليلزم أصحاب أبي حنيفة رحمه الله والله ما صرت فقيها إلا باطلاعي في كتب أبي حنيفة لو لحقته قد لازمت مجلسه
>
> "কেউ ফিকহ অর্জন করতে চাইলে সে যেন ইমাম আবূ হানীফা রা.-এর শিষ্যদের সাহচর্য গ্রহণ করে। আল্লাহর কাসাম! আবূ হানীফা রহ. (অর্থাৎ তাঁর শিষ্যদের) গ্রন্থাদি অধ্যায়ন করেই আমি ফাকীহ হতে পেরেছি। যদি আমি তাঁর সাথে মিলিত হতে পারতাম, তাহলে আমি সর্বক্ষণ তাঁর মাজলিসে বসে থাকতাম।"[৬৪]

৬.২. ইমাম মালিক রহ. নিজে একজন বড় মুজতাহিদ। এতদসত্ত্বেও তিনি ফিকহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর অসাধারণ যোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته "আমি এমন এক অসাধারণ ব্যক্তি (আবূ হানীফা রহ.)কে দেখলাম, যাকে যদি তুমি বলো যে, (গাছের) এ স্তম্ভকে স্বর্ণরূপে প্রমাণিত করো, তাহলে তিনি দলীল-প্রমাণ দ্বারা (গাছের) এ স্তম্ভকে স্বর্ণরূপে প্রমাণিত করে ছাড়বেন।"[৬৫] ইমাম লাইছ ইবনু সা'দ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি মাদীনায় ইমাম মালিক রহ.-এর সাথে সাক্ষাত করি। এ সময় আমি তাঁকে বললাম, আমি তো আপনার কপালে ঘাম মাস্‌হ করার গন্ধ পাচ্ছি!

---

৬০. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ), খ. ১৩, পৃ. ৩৪৬; 'আবদুল 'আযীয আল-বুখারী, কাশফুল আসরার (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩০

৬১. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩৪৬

৬২. প্রাগুক্ত

৬৩. প্রাগুক্ত

৬৪. 'আবদুল 'আযীয আল-বুখারী, *কাশফুল আসরার*, খ. ১, পৃ. ৩০

৬৫. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৮; *যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'*, খ. ৬, পৃ. ৩৯৯; ইবনু খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান* (বৈরূত: দারু ছাদির), খ. ৫, পৃ. ৪০৯

ইমাম মালিক বললেন, عرقت مع أبي حنيفة، إنه لفقيه يا مصري " হে মিসরীয় 'আলিম, আবূ হানীফা রহ.-এর কারণে আমার গলদঘর্ম হয়ে গেছে। তিনি অবশ্যই একজন ফাকীহ।" লাইছ রহ. বলেন, পরে আমি আবূ হানীফাহ রহ.-এর সাথে সাক্ষাত করি এবং তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললাম, আপনার ব্যাপারে ইমাম মালিকের মন্তব্য কতোই না উত্তম! তখন ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, ما رأيت أسرع منه بجواب صادق، وزهد تام "আমি ইমাম মালিক রহ.-এর চেয়ে দ্রুত সঠিক জবাব দিতে পারেন এবং পূর্ণ নির্মোহ এমন কাউকে দেখতে পাইনি।[৬৬] লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো, তিনজনই বড় বড় মুজতাহিদ এবং আলাদা তিনটি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা; এতদসত্ত্বেও তাঁরা যেভাবে একে অপরকে মূল্যায়ন করলেন, তাতে আমাদের জন্য শিক্ষা লাভের অনেক উপকরণ বিদ্যমান।

৬.৩. ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ. দুজনেই দুটি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হওয়া সত্ত্বেও পরস্পর একে অপরকে শ্রদ্ধা করতেন। একদিন ইমাম শাফি'ঈ রা. ইমাম আহমাদ রহ. কে উদ্দেশ্য করে বলেন:

> إذا صح عندكم الحديث، فأخبرونا حتى نرجع إليه أنتم أعلم بالاخبار الصحاح منا، فإذا كان خبر صحيح، فأعلمني حتى أذهب إليه، كوفيا كان أو بصريا أو شاميا.
>
> "যেহেতু হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রে আপনারা শ্রেষ্ঠ, সেহেতু আমার অজানা কোনো সাহীহ হাদীস আপনার সংগ্রহে থাকলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন। সে জন্য প্রয়োজন হলে সুদূর কূফা, বাসরা বা শাম সফর করতেও আমি তৈরি আছি।[৬৭]

অন্য মাযহাবের ইমামের সামনে একজন বরেণ্য ইমামের এমন অতুলনীয় বিনয় প্রকাশ নিঃসন্দেহে তাঁদের ইখলাস, আন্তরিকতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। অপরদিকে ইমাম শাফি'ঈ রহ.-এর প্রতি ইমাম আহমাদ রা.-এর সশ্রদ্ধ অনুভূতিও লক্ষ্য করার মতো। হাদীসে বর্ণিত আছে, إن الله يقيض في رأس كل مائة سنة من يعلم الناس دينهم "প্রত্যেক শতাব্দীর মাথায় আল্লাহ তা'আলা এমন এক ব্যক্তি পাঠান, যিনি মানুষকে দীন শিক্ষা দান করেন।" এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, فكان في المائة الأولى عمر بن عبد العزيز وفي المائة الثانية الشافعي "প্রথম শতাব্দীতে সেই মানুষটি ছিলেন 'উমার ইবনু 'আবদিল 'আযীয র.। আর দ্বিতীয় শতাব্দীতে হলেন ইমাম শাফি'ঈ রহ.। চল্লিশ বছর ধরে তাঁর জন্য আমি দু'আ ও ইস্তিগফার করছি।"[৬৮] তিনি আরো বলেন, ما صليت صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي

৬৬. কাদী 'ইয়াদ, *তারতীবুল মাদারিক...*, (http://www.alwarraq.com), খ. ১, পৃ. ৩৬

৬৭. যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'*, খ. ১১, পৃ. ২১৩

৬৮. মুহাম্মাদ শামসুল হক আল-'আযীমাবাদী, *'আউনুল মা'বূদ* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৫ হি.), খ. ১১, পৃ. ২৬১

"আমি চল্লিশ বছর ধরে প্রত্যেক নামাযে তাঁর জন্য দু'আ করে আসছি।"[৬৯] একবার ইমাম আহমাদ রহ.-এর পুত্র আবদুল্লাহ রহ. তাঁর পিতাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনি কেন ইমাম শাফি'ঈ রহ.-এর কথা বেশি বেশি আলোচনা করেন এবং তাঁর জন্য দু'আ করেন। তখন তিনি জবাব দেন, يا بني كان الشافعي كالعافية للناس وكالشمس للدنيا "প্রিয় পুত্র, ইমাম শাফি'ঈ হলেন মানুষের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ব্যাধির আরোগ্য এবং পৃথিবীর জন্য সূর্যতুল্য।"[৭০] তিনি আরো বলেন, ما رأيت أحدا أتبع للحديث من الشافعي "সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণেও তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।"[৭১]

ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম শাফি'ঈ রহ.-এর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়ে ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, كان الفقه قفلاً على أهله حتى فتحه الله بالشافعي. "ফিকহ তালাবদ্ধ ছিল। ইমাম শাফি'ঈ রহ.-এর মাধ্যমে আল্লাহ সে তালা খুলেছেন।"[৭২] তিনি আরো বলেন, ما أحد يعلم في الفقه كان أحرى أن يصيب السنة لا يخطئ إلا الشافعي "ফিকহের আলোচনায় তাঁর চেয়ে কম ভুল আর কারো নেই।"[৭৩]

৬.৪. ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম মালিক রহ. দুজনেই বড় মুজতাহিদ ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁদের দুজনের পরস্পরের মূল্যায়ন দেখুন, ইমাম শাফি'ঈ রহ. বলেন, عنه أخذنا العلم وإنما أنا غلام من غلمان مالك. "আমি তাঁর খিদমতে থেকে ইলম হাসিল করেছি। আমি তাঁর একজন গোলাম মাত্র।"[৭৪] মুহাম্মাদ ইবনুল হাকাম রহ. বলেন, ইমাম শাফি'ঈ রহ. ইমাম মালিক রহ.-এর কোনো উদ্ধৃতি এভাবে দিতেন যে, هذا قول الأستاذ. "এটা উস্তাদের (অর্থাৎ ইমাম মালিকের) বক্তব্য।[৭৫] ইমাম শাফি'ঈ রহ. বলতেন, ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا من موطأ مالك "জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইমাম মালিক রহ.-এর সংকলিত কিতাবের চেয়ে বিশুদ্ধ কোনো কিতাব পৃথিবীতে নেই।"[৭৬] তিনি আরো বলেন, إذا ذكر العلماء فمالك النجم "'আলিমগণের আলোচনা হলে সকলের মাঝে ইমাম মালিক রহ.-এর অবস্থান হবে নক্ষত্রতুল্য।"[৭৭] তিনি আরো

৬৯. ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক* (বৈরূত: দারুল ফিকর), খ. ৫১, পৃ. ৩৪৬

৭০. প্রাগুক্ত, খ. ৫১, পৃ. ৩৪৯

৭১. আবু নু'আইম, *হিলয়াতুল আউলিয়া*, খ. ৯, পৃ. ১০৭

৭২. ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দামিশক*, খ. ৫১, পৃ. ৩৪৫; নাবাবী, *তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত*, পৃ. ৮৬

৭৩. ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দামিশক*, খ. ৫১, পৃ. ৩৫০

৭৪. কাদী 'ইয়াদ, *তারতীবুল মাদারিক*, খ. ১, পৃ. ৩৬, ১৩৮

৭৫. *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩৬, ১৩৮

৭৬. ইবনু আবী হাতিম আর-রাযী, *আল-জারহু ওয়াত তা'দীল*, খ.১, পৃ. ১২; যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায*, খ. ১, পৃ. ১৫৪

৭৭. যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায*, খ. ১, পৃ. ১৫৪ কোথাও কোথাও ইমাম শাফি'ঈ রাহ.-এর বক্তব্যটি এভাবে এসেছে,.**إذا جاء الأثر، فمالك النجم** -"হাদীসের আলোচনা আসলে সকলের

বলেন, لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز "ইমাম মালিক ও সুফইয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ রহ. না হলে হিজাযের 'ইলম বিলুপ্ত হয়ে যেতো।"[৭৮] অপরদিকে ইমাম মালিক রহ. ইমাম শাফি'ঈ রহ. সম্পর্কে বলেন, "শাফি'ঈ রহ.-এর চেয়ে মেধাবী কোনো কুরাইশী তরুণ আমার কাছে আসেনি।"[৭৯]

চ. দৃঢ় জ্ঞান লাভ করা ছাড়া মতপার্থক্য করা থেকে বিরত থাকা

আমরা আমাদের সালাফে সালিহীন ও মুজতাহিদ ইমামগণকে দেখতে পাই যে, তাঁরা যে কোনো বিষয়ে ফাতওয়া দানের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করতেন না। কারো কোনো প্রশ্নের জবাব দৃঢ়ভাবে জানা না থাকলে তিনি সরাসরি 'জানি না' বলে উত্তর দিতেন, আন্দাজ-অনুমানের ওপর ভিত্তি করে খামাখা ইখতিলাফে জড়িয়ে পড়তেন না। বর্ণিত আছে যে, একবার কিছু লোক 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রা.-এর জনৈক পুত্র থেকে এমন একটি মাস'আলা সম্পর্কে জানতে চাইলো, যে ব্যাপারে তাঁর যথাযথ জ্ঞান ছিল না। এ সময় ইয়াহয়া ইবনু সা'ঈদ রা. তাঁকে বললেন,

وَاللَّهِ إِنِّي لَأُعْظِمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُكَ وَأَنْتَ ابْنُ إِمَامَيِ الْهُدَى - يَعْنِي عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ - تُسْأَلُ عَنْ أَمْرٍ لَيْسَ عِنْدَكَ فِيهِ عِلْمٌ.

> "আপনি হলেন হিদায়াতের দু জন ইমাম অর্থাৎ সাইয়িদুনা 'উমার ও তাঁর পুত্র 'আবদুল্লাহর সন্তান! আপনার নিকট একটি মাস'আলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, অথচ আপনার নিকট এ সম্পর্কে জ্ঞান নেই। আল্লাহর কাসাম! তা কেমন করে হতে পারে? এটা তো রীতিমতো আশ্চর্যের ব্যাপার।"

তিনি জবাব দিলেন:

أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَاللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ أُخْبِرَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ.

> "আল্লাহর কসম! আল্লাহর নিকট এবং তাঁর জ্ঞানী বান্দাহদের নিকট এর চেয়েও বড় জঘন্য ব্যাপার হলো, আমি যথার্থ 'ইলম ছাড়া কোনো মত প্রকাশ করবো কিংবা অবিশ্বস্ত লোকদের নিকট শুনে কিছু বর্ণনা করবো।"[৮০]

হায়ছাম ইবনু জামীল রহ. বলেন, আমি দেখেছি যে, একবার ইমাম মালিক রহ. থেকে চল্লিশটি মাস'আলা জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি মাত্র চারটি বিষয়ের জবাব দেন,

---

মধ্যে ইমাম মালিকের অবস্থান হলো নক্ষত্রের মতো।" (নাবাবী, *তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত*, পৃ. ৬০০)

৭৮. ইবনু আবী হাতিম আর-রাযী, *আল-জারহু ওয়াত তা'দীল*, খ. ১, পৃ. ১২; আল-খাতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, খ. ৯, পৃ. ১৭৯; যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায*, খ. ১, পৃ. ১৫৪

৭৯. ফাখরুদ্দীন আর-রাযী, *মানাকিবুশ শাফি'ঈ*, পৃ. ৫৮

৮০. মুসলিম, *আস-সাহীহ, আল-মুকাদ্দামাহ*, হা.নং: ৩৭

বাকী ছত্রিশটি বিষয় সম্পর্কে বলেন, لا أدري "আমি জানি না।"[৮১] ইমাম মালিক রহ. সম্পর্কে আরো জানা যায় যে, একবার তাঁকে পঞ্চাশটি মাস'আলা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল; কিন্তু তিনি একটি মাস'আলারও জবাব দেননি; বরং বললেন:

من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب

> "যে ব্যক্তি কোনো মাস'আলার উত্তর দিতে চায়, সে যেন প্রথমে নিজেকে জান্নাত ও জাহান্নামের সামনে পেশ করে এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের পথ বের করে নেয়, অতঃপর উত্তর প্রদান করে।"[৮২]

ইমাম শাফি'ঈ রহ.কে একটি মাস'আলা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি তার উত্তর দেননি। এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب "আমি যখন জানবো, চুপ থাকার মধ্যে, না-কি উত্তর দেওয়ার মধ্যে ছাওয়াব হয়, তখনই আমি উত্তর দেবো।"[৮৩] ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ. সম্পর্কেও জানা যায় যে, তিনি অধিকাংশ সময় প্রশ্নের উত্তরে 'আমি জানি না' বলতেন। ইমাম আল-আছরাম [মৃ. ২৭৩ হি.] রহ. বলেন, سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول لا أدري "আমি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.কে অধিকাংশ সময় মাস'আলা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে 'আমি জানি না' বলতে শোনেছি।"[৮৪]

ছ. গুরু ও অভিজ্ঞজনের ওপর ফাতওয়ার ভার ন্যস্ত করা

ইসলামের একটি মহান শিক্ষা হলো, জ্ঞানে, গুণে ও বয়সে বড়জনকে শ্রদ্ধা করা। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا "যে আমাদের ছোটজনকে দয়া করবে না এবং বড়জনকে সম্মান করবে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।"[৮৫] কাজেই বড়জনদের সামনে নিজের পাণ্ডিত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে চেষ্টা করা এবং এতদুদ্দেশ্যে তাঁদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে খামাখা মতবিরোধে লিপ্ত হওয়া সমীচীন নয়। কখনো কোথাও নিজের অভিমত পেশ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা

---

৮১. নাবাবী, *আদাবুল ফাতওয়া* (দিমাশক: দারুল ফিকর, ১৪০৮ হি.), পৃ. ১৬; নু'মান আল-আলূসী, *জালাউল 'আইনাইন*, খ. ১, পৃ. ১৮৩; ইবনু আবিল ওয়াফা, *আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাতু..*, খ. ২, পৃ. ৪৫৮

৮২. নাবাবী, *আদাবুল ফাতওয়া*, পৃ. ১৬

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৮৪. প্রাগুক্ত

৮৫. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাবুল বির্‌র..), হা. নং: ১৯১৯ কোনো কোনো সূত্রে وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا এর পরিবর্তে وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا এসেছে। এর অর্থ হলো- যে আমাদের বড়জনের অধিকার জানলো না...। (আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, [কিতাবুল আদাব], হা.নং: ৪৯৪৫)

হয়েছে যে, আমাদের সালাফে সালিহীন ও মুজতাহিদ ইমামগণ যে কোনো বিষয়ে ফাতওয়া দানের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করতেন না। তাঁরা নিজেরা পারত পক্ষে ফাতওয়া দান করা থেকে বিরত থাকতেন এবং আন্তরিকভাবে কামনা করতেন যে, তাঁদের পক্ষ থেকে অপর কেউ ফাতওয়া দান করুক। আবার অনেকেই নিজে মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও গুরু ও অভিজ্ঞ জনের নিকট ফাতওয়ার ভার ন্যস্ত করতে চাইতেন। ইমাম শা'বী, আল-হাসান আল-বাসরী ও আবূ হাসীন আল-আসাদী রহ. প্রমুখ তাবি'ঈগণ বলেন:

> إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُفْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ وَلَوْ وَرَدَتْ عَلَى عُمَرَ رضي الله عنه لَجَمَعَ لَهَا أَهْلَ بَدْرٍ.
>
> "তোমাদের যে কেউ তো যে কোনো মাস'আলায় ফাতওয়া দিতে চাও। অথচ সাইয়িদুনা 'উমার রা.-এর নিকট যখন কোনো মাস'আলা উত্থাপিত হতো, তখন তিনি নিজে উত্তর না দিয়ে এর জন্য বাদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণকে একত্রিত করতেন, যেন তাঁরাই মাস'আলাটির উত্তর প্রদান করেন।"[৮৬]

'আবদুর রাহমান ইবনু আবী লায়লা রহ. বলেন:

> أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم – فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه قد كفاه الحديث، ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا.
>
> "আমি রাসূলুল্লাহ স.-এর একশ বিশ জন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছি; কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ হাদীস বর্ণনা করতে চাইতেন না। তাঁরা প্রত্যেকেই কামনা করতেন যে, তাঁর অপর ভাইদের হাদীস বর্ণনা তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে। অনুরূপভাবে তাঁদের মধ্যে কেউ ফাতওয়া দিতে চাইতেন না। তবে তাঁরা প্রত্যেকেই কামনা করতেন যে, তাঁর অপর ভাইদের ফাতওয়া তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে।"[৮৭]

মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান আল-মুরাদী রহ. থেকে বর্ণিত, মাদীনার বিশিষ্ট শায়খ আবূ ইসহাক রহ. বলেন:

> "আমি ঐ যুগে লোকদের দেখতাম যে, যখন তাদের নিকট কেউ কোনো প্রশ্ন নিয়ে আসতো, তখন তারা তাকে এক মাজলিস থেকে অন্য মাজলিসে পাঠিয়ে দিতেন। এভাবে তাকে মাদীনার বিশিষ্ট ফাকীহ সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রা.-এর নিকট পাঠানো হতো। এর কারণ ছিল, তারা নিজেরা ফাতওয়া দিতে পছন্দ করতেন না এবং তাঁরা সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব রা.কে এ জন্য الجريء (দুঃসাহসী) নামে অভিহিত করতেন।"[৮৮]

---

৮৬. নাবাবী, *আদাবুল ফাতওয়া*, পৃ. ১৬; ইবনুস সালাহ, *আদাবুল মুফতী ওয়াল মুস্তাফতী*, পৃ. ১০
৮৭. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা* (বৈরূতঃ দারু ছাদির), খ. ৬, পৃ. ১১০; ইবনুল মুবারাক, *আয-যুহদ*, হা.নং: ৫৮; বায়হাকী, *আল-মাদখাল..*, হা.নং: ৬৫৪, ৬৫৫; ইবনু 'আবদিল বারর, *জামি'উ বায়ানিল 'ইলম*, খ. ২, পৃ. ৩১৫ (হা. নং ১১৩৭)
৮৮. ইবনু 'আবদিল বারর, *জামি'উ বায়ানিল 'ইলম*, খ. ২, পৃ. ৩১৭ (হা.নং: ১১৪৩)

সুফইয়ান আছ-ছাওরী রহ. নিজে একজন মুজতাহিদ ও ইমাম ছিলেন এবং ফিকহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সাথে তাঁর যথেষ্ট মতপার্থক্যও ছিল; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি তাঁর মতামতের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতেন। তিনি তাঁকে যুগের শ্রেষ্ঠ ফাকীহরূপে জানতেন।[৮৯] বর্ণিত আছে যে, একসাথে হজ্জ পালন কালে সুফইয়ান আছ-ছাওরী রহ. ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর পেছনে চলতেন। আর কোনো মাস'আলা পেশ হলে তিনি নীরব থাকতে। ইমাম আবূ হানীফা রহ. ই জবাব দিতেন।

জ. শরয়ী দলীলনির্ভর প্রচলিত রীতির প্রতি নজর রাখা

সালাফে সালিহীন ও মুজতাহিদ ইমামগণ ফাতওয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে যথাসাধ্য দেশে শরয়ী দলীলনির্ভর প্রচলিত রীতির প্রতি নজর রাখতে চেষ্টা করতেন। কোথাও কোনো মুজতাহিদ ইমামের মতানুযায়ী কোনো রীতি প্রচলন লাভ করে থাকলে তাঁরা ঐ এলাকায় এরূপ কোনো রীতির পরিপন্থী ফাতওয়া প্রচার করে এবং সে আলোকে 'আমালের জন্য লোকদেরকে উৎসাহিত করে উম্মাতের মধ্যে কোনোরূপ বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে কিংবা তাদেরকে বিভক্ত করতে চাইতেন না। হুমাইদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি খালীফা 'উমার ইবনু 'আবদিল আযীয রা.-এর নিকট ফাকীহদের মতপার্থক্য দূর করে সকলকে অভিন্ন মতে একত্রিত করতে আরয করলাম, لو جمعت الناس على شيء! "যদি আপনি সকল লোককেই অভিন্ন মতের ওপর একত্রিত করতেন!" তিনি জবাব দেন, ما يسرني انهم لم يختلفوا. "তাঁদের অর্থাৎ সাহাবীগণের মতভিন্নতা না থাকাটা আমার কাছে আনন্দের বিষয় নয়।" এরপর তিনি বিভিন্ন দেশে এ মর্মে নির্দেশ লিখে পাঠান, ليقضي كل قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم. "প্রত্যেক জনগোষ্ঠীই যেন নিজ নিজ দেশের ফাকীহগণের সর্বসম্মত মতের ভিত্তিতে ফায়সালা পেশ করে।"[৯০] ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, খলীফা হারূনুর রাশীদ যখন উম্মাতের বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে সকলকে মুওয়াত্তার ওপর একমত করতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি এরূপ কাজ করতে বাঁধা দেন এবং বলেন:

> "রাসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবীগণ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে গেছেন এবং তাঁরা প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট থেকে যা শুনেছেন তা-ই বর্ণনা করেছেন। উপরন্তু, প্রত্যেকে দেশের 'আমাল সে-ই অবস্থার ওপরই স্থিতিশীলতা লাভ করেছে, যা রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট থেকে তাদের কাছে পৌঁছেছে। কাজেই আপনি লোকদেরকে তাদের স্ব স্ব অবস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করবেন না।"[৯১]

---

৮৯. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩৪৪
৯০. দারিমী, *আস-সুনান*, মুকাদ্দামাহ, পরিচ্ছেদ: ইখতিলাফুল ফুকাহা', হা. নং: ৬২৮
৯১. 'আতিয়্যাহ, *শারহুল আরবাঈন*, পৃ. ৭

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায়, আমাদের পূর্বসূরী ইমামগণ দীনের গবেষণাধর্মী নানা অপ্রধান বিষয়ে ইজতিহাদের নিয়ম অনুসরণ করে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন। বলাই বাহুল্য যে, ক্ষেত্রবিশেষে তাঁদের এ ইজতিহাদ বিভিন্ন ফলাফল নিয়ে এসেছে সত্যি; কিন্তু তাঁদের সে বিভিন্নতায় কোনো প্রকারের জিদ্, প্রগল্ভতাও গোঁড়ামির স্থান ছিল না। তাঁরা যথাসাধ্য মতবিরোধ থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করতেন। ক্ষেত্রবিশেষে যে মতপার্থক্যগুলো হয়েছে তার পেছনে প্রধান কারণ ছিল দলীলের প্রচ্ছন্নতা বা দ্ব্যর্থবোধকতা কিংবা দুর্বলতা। তদুপরি ক্ষেত্রবিশেষে তাঁদের মধ্যে যে মতপার্থক্য সংঘটিত হয় তা তাঁদের মধ্যকার পারস্পরিক হৃদ্যতা ও শ্রদ্ধাবোধে সামান্যতমও ব্যত্যয় ঘটাতে পারেনি। তাঁদের ইখলাস ও উদারতার অবস্থা এতোই পরিচ্ছন্ন ছিল যে, যখনই তাঁরা কোনো বিশুদ্ধ দলীল পেতেন কিংবা অন্যের যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হতেন, তখন তাঁরা কোনোরূপ কূটকচালের আশ্রয় নেয়া ব্যতীত সাথে সাথেই প্রসন্নচিত্তে তা গ্রহণ করে নিতেন। এমনকি তাঁরা শিক্ষক হয়েও ছাত্রদের বিশুদ্ধ যুক্তি ও বাস্তবসম্মত মতামত গ্রহণ করে নিতেও কোনো সময়ই কোনোরূপ কুণ্ঠিত হননি। উল্লেখ্য যে, তাঁদের এরূপ ইজতিহাদভিত্তিক উদারনৈতিক মতপার্থক্য অনেক ক্ষেত্রে উম্মাতের জন্য বহু কল্যাণও বয়ে এনেছে। যেমন-

ক. যুগ ও পরিস্থিতির চাহিদা পূরণার্থে বিশেষ প্রয়োজনে নিজের মাযহাবের পরিবর্তে অন্য মাযহাব অনুসরণের পথ উন্মুক্ত রয়েছে। বলাই বাহুল্য, মাযহাবের বিভিন্নতা না থাকলে এ সুযোগ লাভ করা সম্ভব হতো না। অর্থাৎ কোনো বিষয়ে ইমামগণ মতভিন্নতা পোষণ করলে পরবর্তীদের জন্য (বিশেষ প্রয়োজনে) যে কোনো একটি মত অনুসরণ করার সুযোগ রয়েছে। পক্ষান্তরে কোনো বিষয়ে তাঁরা ঐকমত্য পোষণ করলে তার বাইরে যাওয়ার ইখতিয়ার কারো থাকতো না।[৯২] তাছাড়া ইমামগণের মতভিন্নতার কারণে ক্ষেত্রবিশেষে নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের সুযোগও তৈরি হয়।[৯৩] এসব কারণে অনেক ‘আলিমই ইমামগণের ইখতিলাফকে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ

৯২. যেমন হানাফী মাযহাবে নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীকে অন্যত্র বিবাহের জন্য ৯০ বছর অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। এর ফলে বহু মুসলিম নারীর জীবনে সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট নেমে আসে। পরবর্তীকালে এ সংকটাবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য হানাফী ইমামগণ নিজেরাই এ মত থেকে ফিরে আসেন এবং তাঁদের কেউ কেউ মালিকী মাযহাব অনুসারে নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীকে অন্যত্র বিবাহের জন্য চার বছর অপেক্ষা করতে বলেন। আবার তাঁদের অনেকেই বিষয়টি আদালতের রায়ের ওপর ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। (ইবনু নুজাইম, *আল-বাহরুর রা'য়িক*, খ. ৫, পৃ. ১৭৮; যায়লা‘ঈ, *তাবয়ীনুল হাকা'য়িক*, খ. ৩, পৃ. ৩১১)

৯৩. যেমন- মদখোর ও অন্যান্য কাবীরা গুনাহকারীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু দাবা খেলা হানাফী মাযহাবে কাবীরা গুনাহ হলেও শাফি‘ঈ ও মালিকী মাযহাব মতে তা নয়। ফলে দাবা খেলায় জড়িতদের সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শনা করা হয়।

থেকে উম্মাতের জন্য একটি বিরাট রাহমাত ও প্রশস্ততার উপলক্ষ মনে করেন।[৯৪] ইবনু আবী ইয়া‘লা [মৃ. ৫২৬ হি.] রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.-এর শিষ্য বিশিষ্ট হানাফী ফাকীহ ইসহাক ইবনু বাহলূল আল-আম্বারী [১৬৪-২৫২ হি.] রহ. তাঁর একটি কিতাবের নাম রাখেন ‘كتاب الاختلاف’ (মতানৈক্যের গ্রন্থ)। ইমাম আহমাদ রহ. এ কিতাবটি দেখে তাঁকে বললেন, “তুমি গ্রন্থটির নাম রাখো ‘كتاب السعة’ (প্রশস্ততার গ্রন্থ); ‘কিতাবুল ইখতিলাফ’ নাম রেখো না।”[৯৫] মূসা আল-জুহানী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাইয়িদুল কুররা’ তালহা ইবনু মুসাররাফ [মৃ. ১১২ হি.] রহ.-এর নিকট যখন (ইমামগণের) কোনো মতপার্থক্যের কথা আলোচনা করা হতো, তখন বলতেন, لا تقولوا: الاختلاف، ولكن قولوا: السعة -“তোমরা একে ‘মতপার্থক্য’ বলো না; বরং তোমরা একে ‘প্রশস্ততা’ বলো।”[৯৬]

খ. ইমামগণের মতভিন্নতার কারণে লোকদের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে ‘আমাল তরকের কারণে ভয় ও শঙ্কা তৈরি হয়। অপরদিকে তারা ক্ষেত্রবিশেষে চূড়ান্ত হতাশা থেকেও নিস্কৃতি লাভ করে। পক্ষান্তরে ইমামগণ কোনো কোনো বিষয়ে একমত হলে লোকেরা হয়তো চূড়ান্ত হতাশা কিংবা ঔদাসিন্যের শিকার হয়ে পড়তো।[৯৭]

গ. ইমামগণের মতভিন্নতার কারণে ফিকহ শাস্ত্র প্রভূত সমৃদ্ধি লাভ করেছে এবং ক্রমশ তা বিস্তৃতি লাভ করে চলেছে। এর ফলে বর্তমানে শরীআহ বিশেষজ্ঞগণের পক্ষে বহু আধুনিক বিষয়ে স্থান, সময় ও পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী শরয়ী দলীলনির্ভর বাস্তব ও যুক্তিসম্মত রায় প্রদান করা সম্ভব হয়ে ওঠেছে। এতে উত্তরোত্তর সর্বমহলে ইসলামী ফিকহের যৌক্তিকতা, গ্রহণযোগ্যতা ও সর্বজনীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রফেসর মুস্তাফা আয-যারকা’ রহ. বলেনঃ

৯৪. ইবনু তাইমিয়্যাহ, *শারহুল ‘উমদাহ*, খ. ৪, পৃ. ৫৬৯; ইবনু ‘আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ১, পৃ. ১৭০

৯৫. ইবনু আবী ই‘য়ালা, *তাবাকাতুল হানাবিলাহ*, খ. ১, পৃ. ১১০; ইবনু তাইমিয়্যাহ, *শারহুল ‘উমদাহ*, খ. ৪, পৃ. ৫৬৭; ইবনু মুফলিহ, *আল-মাকসিদ আল-আরশাদ..*, খ. ১, পৃ. ২৪৮

৯৬. আবু নু‘আইম, *হিলয়াতুল আউলিয়া*, খ. ৫, পৃ. ১৯

৯৭. যেমন- ইমামগণের মধ্যে কারো কারো মতে, ইচ্ছাকৃত নামায তরককারী কাফির। পক্ষান্তরে তাঁদের অনেকেই ফাতওয়া দিয়েছেন যে, ইচ্ছাকৃত নামায তরককারী যদি নামাযের ফারযিয়্যাত অস্বীকার না করে, তা হলে শুধু নামায তরক করার কারণে তাকে কাফির বলা যাবে না; সে ফাসিক হবে। এ মতভিন্নতার কারণে প্রথমোক্ত ইমামগণের অনুসারীদের মনে যেমন কিঞ্চিত আশার সঞ্চার হয় (এবং এ কারণে তাঁরা বে-নামাযীকে কাফির বলা সত্ত্বেও তার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো অথবা মুসলিম কবরস্থানে তাকে দাফন না করার কথা স্পষ্টভাবে বলেননি), তেমনি অপর ইমামগণের অনুসারীদের মনে শঙ্কা ও সতর্কতা দেখা দেয়। কেননা বে-নামাযী যখন জানবে যে, কোনো কোনো ইমামের ফাতওয়া মতে সে কাফির বলে গণ্য, তখন স্বভাবতই তার অন্তর ভয়ে কেঁপে ওঠবে এবং তাওবার মাধ্যমে নামাযের প্রতি যত্নবান হবে।

قد يظن بعض المتوهمين ممن لا علم عندهم ولا بصيرة أن اختلاف الاجتهادات في الفقه الإسلامي نقيصة، ويتمنون لو لم يكن إلا مذهب واحد، ... وأما الاختلاف الفقهي في الأحكام العملية المدنية فهو من المفاخر والذخائر؛ لأنه ثروة تشريعية كلمّا اتسعت كانت أروع وأنفع وأنجع .

"কতিপয় কাণ্ডজ্ঞানহীন অর্বাচিন লোক ধারণা করে যে, ইসলামী ফিকহে ইজতিহাদী মতপার্থক্য একটি ত্রুটি। তারা আশাবাদ ব্যক্ত করে, মাযহাব যদি কেবল একটিই হতো! ... বস্তুতপক্ষে ব্যবহারিক গণবিধি-বিধানের ক্ষেত্রে ফিকহী ইখতিলাফ একটি গর্ব ও মূল্যবান সম্ভার বিশেষ। কেননা তা হলো আইনী সম্পদ, যা যতোই বৃদ্ধি পাবে, ততোই তার সৌন্দর্য, উপকারিতা ও কার্যকারিতা বাড়তে থাকবে।"[৯৮]

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায়, আমাদের পূর্বসূরী ইমামগণ দীনের নানা ব্যবহারিক বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন সত্যি; কিন্তু তাঁদের সে বিভিন্নতায় কোনো প্রকারের জিদ্ ও গোঁড়ামির স্থান ছিল না। ক্ষেত্রবিশেষে তাঁদের মধ্যে যে মতপার্থক্য হয়েছে তার পেছনে প্রধান কারণ ছিল দলীলের প্রচ্ছন্নতা বা দ্ব্যর্থবোধকতা কিংবা দুর্বলতা। তদুপরি তাঁদের এ মতপার্থক্য তাঁদের মধ্যকার পারস্পরিক হৃদ্যতা ও শ্রদ্ধাবোধে সামান্যতমও ব্যত্যয় ঘটাতে পারেনি। তাঁদের ইখলাস ও উদারতার অবস্থা এতোই পরিচ্ছন্ন ছিল যে, যখনই তাঁরা কোনো বিশুদ্ধ দলীল পেতেন কিংবা অন্যের যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হতেন, তখন তাঁরা কোনোরূপ কূটকচালের আশ্রয় নেয়া ব্যতীত সাথে সাথেই প্রসন্নচিত্তে তা গ্রহণ করে নিতেন। অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হলো, উত্তরকালে মুকাল্লিদরা ক্রমে তাঁদের মুজতাহিদ ইমামগণের সেই উদারনৈতিকতা ও পরমত সহিষ্ণুতা হারিয়ে ফেলে। বর্তমানে কোথাও কোথাও অবস্থা এতোই নাজুক যে, ইখতিলাফ করার ক্ষেত্রে তারা ন্যূনতম শিষ্টাচার রক্ষার কোনো গরজ অনুভব করছেন না। এক মাযহাবের অনুসারীরা অন্য মাযহাবের অনুসারীদেরকে পথভ্রষ্টরূপে আখ্যায়িত করে। প্রত্যেকে নিজের মাযহাবকে একমাত্র সঠিক এবং অন্যের মাযহাবকে ভ্রান্তরূপে চিহ্নিত করতে যাবতীয় প্রয়াস নিয়োগ করে। বলতে গেলে ইখতিলাফের ক্ষেত্রে তাদের অনেকেরই একান্ত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, নিজের ও নিজের মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ এবং নিজের ও নিজের দলের স্বার্থ চরিতার্থ করা। আত্মপ্রীতি, পার্থিব মোহ, প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব ও হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয়ে অক্ষমতাও এর প্রধান প্রধান কারণ। এ জাতীয় মতবিরোধ একদিকে তাদের পরস্পরের মধ্যে চরম হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করছে, অপরদিকে তারা দীনকে টুকরো টুকরো করছে এবং উম্মাতকে নানা দলে-উপদলে বিভক্ত করছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এ অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন! আমীন!!

---

৯৮. মুস্তাফা আয-যারকা', *আল-মাদখালুল ফিকহী*, খ. ১, পৃ. ২৬৯